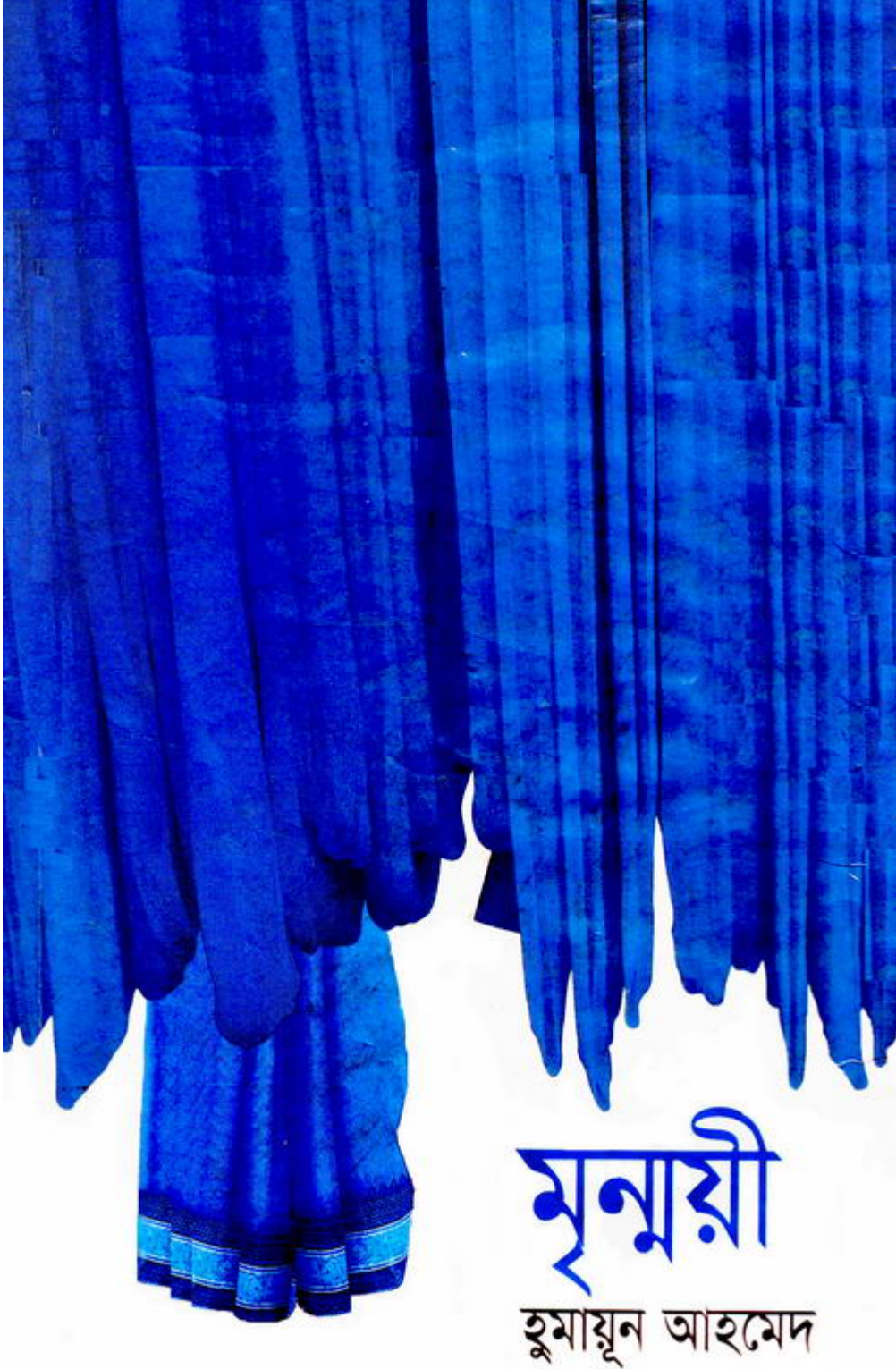






আমার বাবার নাম মইনু মিয়া। খুবই হাস্যকর নাম। কাঠ মিস্ত্রি বা দরজিদের এরকম নাম থাকে। আমার দাদাজান দরজি ছিলেন, এবং তিনি তাঁর মতো করেই ছেলের নাম রেখেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, তাঁর ছেলে গিরায় হিসাব না করে, নেনোমিটার, পিকো সেকেন্ডে হিসাব করবে। আমার বাবা মইনু মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করবেন।

এখন অবশ্য তাঁর নাম মাইন খান। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট করে নাম বদলেছেন। তবে তাঁর রক্তে দরজির যে ব্যাপারটা পৈতৃক সূত্রে চলে এসেছে তা এখনো আছে। আমার বাবা মাইন খান বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গার্মেন্টসের কারখানা দিয়েছেন। গার্মেন্টসের নাম 'মুনুয়া এ্যাপারেলস'। মুনুয়া আমার নাম। ভালো নাম মুনুয়া, ডাক নাম মূ। আমার ভাবতে খুবই খারাপ লাগে যে, বিদেশী লোকজন বাবার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঘাড়ের সঙ্গে যে স্টিকার লেগে আছে সেখানে লেখা মুনুয়া। অচেনা মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধে আমাকে বাস করতে হচ্ছে।

বাবা যেমন ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে এফিডেভিট করে তাঁর নাম বদল করেছেন, আমি নিজেও তাই করব। অন্য কোনো নাম ঠিক করব, যে নাম কেউ ঘাড়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে না। আমি মনে মনে নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাবাকেও একদিন বললাম, বাবা, আমাকে সুন্দর একটা নাম দেখে দাও তো। আমি ঠিক করেছি নাম বদলাব।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, মুনুয়া তো খুবই সুন্দর নাম।

নামটায় ঘামের গন্ধ বাবা।

ঘামের গন্ধ মানে কী? বুঝিয়ে বলতো। তোর সব কথা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার নেই।

পরে একসময় বুঝিয়ে বলব। আজ না।

না এখনই বল। মুনুয়ার সঙ্গে ঘামের সম্পর্ক কী?

বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে তাকিয়ে রইলেন। খুব অবাক হলে তিনি এই কাজটা করেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেন। আমার ধারণা তিনি এই কাজটা করেন যাতে অন্যরা তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি দেখতে পায়।

আমার বাবা খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ। এক থেকে দশের মধ্যে যদি বুদ্ধির স্কেল করা হয় সেই স্কেলে বাবার বুদ্ধি হবে ১৩, দশের চেয়েও তিন বেশি। বাবাকে বিচার করতে হলে স্কেলের বাইরে যেতে হবে। এটা তিনি নিজে ভালো করে জানেন। তার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা চেষ্টা থাকে যেন অন্যরাও ব্যাপারটা চট করে ধরে ফেলে।

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মানুষকে বোকা বোকা লাগে। বাবাকে আজ সে রকমই লাগছে। তিনি গা দুলিয়ে হাসার চেষ্টা করছেন। হাসিটা মনে হচ্ছে ঠোঁট থেকে নেমে এসে শূন্যে ঝুলছে। এই হাসির আমি নাম দিয়েছি ‘ঝুলন্ত-মাকড়সা হাসি’। মাকড়সা যেমন সুতা ধরে নিচে নামতে থাকে, আবার ওপরে ওঠে, আবার খানিকটা নিচে নেমে যায়— এই হাসিও সে রকম। মাঝে মাঝে হাসি উঠছে, মাঝে মাঝে নামছে। ব্যাপারটা বাবাও বুঝতে পারছেন। তারপরেও এই বোকা হাসি থেকে বের হতে পারছেন না। আমার ধারণা তিনি নিজের ওপর খানিকটা রেগেও গেছেন। মনের ভেতর চাপা রাগ, মুখে নকল ঝুলন্ত-মাকড়সা হাসি— সব মিলিয়ে খিচুড়ি অবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক মুনুয়া এ্যাপারেলসের এমডি মাইন খান সাহেবকে দেখে আমার খানিকটা মায়াই লাগছে।

বাবার ভেতর এই ‘খিচুড়ি’ অবস্থা তৈরি করেছেন তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজহার উদ্দিন। প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি একজন মানুষ। অতিরিক্ত রোগা। লম্বা এবং রোগা মানুষরা সাধারণত খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন। ইনি হাঁটেন বুক টান করে। হাঁটা অবস্থায় তাকে দেখলে মনে হবে একটা সরল রেখা হেঁটে চলে যাচ্ছে। তার ঘাড়ের খানিকটা সমস্যা আছে। তিনি ঘাড় কাত করে পাশের জনকে দেখতে পারেন না। তাকে পুরো শরীর ঘোরাতে হয়। তখন তাঁকে আর মানুষ মনে হয় না। মনে হয় রোবট সিগন্যাল পেয়ে ঘুরছে।

আজহার চাচা নানান ধরনের ব্যবসা করেন। সেইসব ব্যবসার প্রায় সবই দুর্নন্দরী। বাড়ডায় তাঁর একটা কারখানা আছে, সেখানে নকল শ্যাম্পু তৈরি হয়। এবং বিদেশী বোতলে ভর্তি হয়ে বাজারে বিক্রি হয়। একবার তিনি টেলিফোন করে আমাকে বললেন, মুনুয়া মা শোনো, ইংল্যান্ডের একটা শ্যাম্পু আছে পেনটিন না কী যেন নাম। ঐটা কিনবে না।

আমি বললাম, কেন আপনার কারখানায় তৈরি হচ্ছে ?

আজহার চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত কথার দরকার কী ? কিনতে না করেছি কিনবে না ।

আজহার চাচা গোপন পথে চালনা পোর্টে বিদেশী সিগারেট আনেন । মদ আনেন । তিনি নিজে মদ সিগারেট কিছুই খান না । অতি আল্লাহ ভক্ত মানুষ । রমজান মাস ছাড়াও প্রতি মাসে তিন চার দিন রোজা থাকেন । বৃদ্ধ বয়সে শরীর নষ্ট হয়ে গেলে রোজা থাকতে পারবেন না । এই কারণেই আগে ভাগে রোজা রেখে ফেলা । তবে বাবার জন্যে প্যাকেট করে বোতল প্রায়ই নিয়ে আসেন । আমাদের ঘর ভর্তি হয়ে গেছে নানান সাইজের বোতলে । এর অনেকগুলোতে পানি ভরে মানিপ্লাস্ট লাগানো হয়েছে । বিদেশী মদের বোতলে মানিপ্লাস্ট খুব ভালো হয় ।

আজহার চাচা উমরা হজ করতে গিয়েছিলেন মক্কা শরীফ । সেখান থেকে বাবার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছেন । উপহারের প্যাকেট হাতে নেবার পর থেকেই আমার বুদ্ধিমান বাবা বোকার হাসি হাসছেন । তার চোখ মুখও কেমন যেন বদলে গেছে । উপহারটা হলো কাফনের কাপড় ।

আজহার চাচা বাবার দিকে তাকিয়ে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, নবীজীর কবর মোবারক ছোঁয়ায়ে এনেছি । তিন সেট আনলাম— আমার জন্যে একসেট, আমার স্বপুত্র সাহেবের জন্যে একসেট আর তোমার জন্যে একসেট ।

বাবা বললেন, ভালো করেছ । অতি উত্তম করেছ ।

আজহার চাচা বললেন, ধর্মকর্মের দিকে তোমার টান তো সামান্য কম, এইজন্যে ইচ্ছা করেই কাফনের কাপড়টা আনলাম । চোখের সামনে এই জিনিস থাকলে পরকালের চিন্তা মাথায় আসে । তাছাড়া চলে যাবার সময় তো আমাদের হয়েই গেছে । তোমার কত চলছে— ফিফটি টু না থ্রি ?

টু ।

তাহলে তো খবর হয়ে গেছে । সিগনাল ডাউন । আজরাইলকে নিয়ে ট্রেন রওনা দিয়েছে । মেল ট্রেন, পথে থামবে না ।

বাবা শুকনা গলায় বললেন, ঠিক বলেছ ।

আজহার চাচা বললেন, কাপড়টা পছন্দ হয় কি-না দেখ । সাধারণ মার্কিন লং ক্লথ না । হাইকোয়ালিটি পপলিন । সৌদি রাজপরিবারের সবার এই কাপড়ের কাফন হয় । খোঁজ-খবর নিয়ে কিনেছি ।

মনে হয় অনেক ঝামেলা করেছ ।

পছন্দ হয়েছে কি-না বল। এইসব গিফট সবাই আবার সহজে নিতে পারে না। আমার শ্বশুর সাহেব তো খুবই রাগ করলেন। আমাকে কিছু বলেনি। আমার শাশুড়ি আমার সঙ্গে গজগজ করেছেন। তুমি আবার রাগ করো নি তো ?

বাবা গা দুনিয়ায় নকল হাসি হাসতে হাসতে বললেন, রাগ করার কী আছে ? তার মুখের হাসি আরো ঝুলে গেল। আজহার চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা মুনায়ী, তোমার জন্যেও সামান্য উপহার আছে। মক্কার মিষ্টি তেতুল আর একটা তসবি।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ চাচা।

তসবির গুটিগুলা প্লাষ্টিকের না, আকিক পাথরের। তুমি জান কি-না জানি না, আকিক পাথর হলো আমাদের নবীজীর খুব পছন্দের পাথর। পবিত্র কোরান মজিদেও আকিক পাথরের উল্লেখ আছে। তেতুল একটু খেয়ে দেখো তো মা। চিনির মতো মিষ্টি। এক বোতল জমজমের পানিও এনেছি। ভালো জায়গায় তুলে রাখো। অসুখ-বিসুখ হলে চায়ের চামচে এক চামচ খাবে। তবে খেতে হবে খুবই আদবের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে না। বসে খাবে, এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবে। ভালো কথা— নাপাক অবস্থায় খাবে না।

আমি বললাম, আপনি কি চা খাবেন চাচা ? আপনার তো মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। আদা দিয়ে এক কাপ চা নিয়ে আসি ?

নিয়ে আয় এক কাপ চা। সন্ধ্যার পর চা খেলে আমার অবশ্য ঘুমের সমস্যা হয়। ঠিক আছে তুই যখন বলছিস— তুই তো জানিস না মা, তোকে অত্যন্ত পছন্দ করি। নবীজীর রওজা মোবারকে যে কয়জনের জন্যে দোয়া করেছি তুই আছিস তাদের মধ্যে। চা নিয়ে আয়, খেয়ে বিদায় হই।

আজহার চাচা একটু আগে আমাকে তুমি তুমি করে বলছিলেন। এখন তুই তুই করছেন। এর মানে হলো তিনি এখন আমার প্রতি খুবই মমতা পোষণ করছেন। বাবাকেও মাঝে মাঝে তিনি তুই বলার চেষ্টা করেন। বাবা পান্ডা দেন না।

আমি বললাম, রাতে খেয়ে যান না চাচা। আপনার প্রিয় তরকারি রান্না হয়েছে।

আজহার চাচা অবাক হয়ে বললেন, আমার যে প্রিয় তরকারি আছে তাইতো জানি না। আমার প্রিয় তরকারি কী ?

ছোট মাছ দিয়ে সজনা।

তুই মনে করে বসে আছিস ? আশ্চর্য কাণ্ড! কবে তোকে বলেছিলাম, আমার নিজেরই তো মনে নাই। মাইন দেখেছ তোমার এই মেয়ে তো বড়ই আশ্চর্য! আচ্ছা ঠিক আছে, রাতের খানা খেয়েই যাই।

বাবা বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছেন। আজহার চাচার রাতে ভাত খাবার জন্যে থেকে যাবার ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করছেন না। বুদ্ধিমান মানুষ অল্প বুদ্ধির মানুষদের সঙ্গ পছন্দ করে না। অল্প বুদ্ধির মানুষদেরকে দিয়ে অনেক কাজ আদায় করা যায় বলেই তাদের সহ্য করা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার জন্যে এক সময় আজহার চাচার বুদ্ধি পরামর্শ এবং অর্থের বাবার প্রয়োজন ছিল। এখন প্রয়োজন নেই। আজহার চাচা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। তাঁর হয়তো ধারণা হয়েছে বাবা তাঁর হজের গল্প খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। বাবার চোখে মুখে মোটা দাগের বিরক্তি কিছুই আজহার চাচার চোখে পড়ছে না। তিনি বাবার দিকে ঝুঁকে এসে হজের গল্প শুরু করলেন—

কাবা তোয়াক্ফের সময় কী ঘটনা ঘটেছে শোনো। আমার পাশাপাশি হাঁটছে এক আফ্রিকান মহিলা। চার পাঁচ মণ ওজন। হাতির মতো থপথপ শব্দ করে হাঁটে। পায়ের ওপর পাড়া দেয়। কনুই দিয়ে গুঁতা দেয়, পিঠে ধাক্কা দেয়। আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তো আমি মেয়েছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। এমন বিপদে পড়লাম! দোয়া টোয়া সব ভুলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি এই মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকা করে বলল, ‘ছেরেং ছেরেং’। একটু পর পর বলে, বলে আর মুখ বাঁকা করে হাসে। ছেরেং মানে কী জানি না— নিশ্চয়ই কোনো গালাগালি। মাইন তুমি কি ছেরেং শব্দের মানে জানো ?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, ইদ্দিস ভাষায় ছেরেং মানে হলো সরু, যেমন ধর ছেরেং গা। গা হলো নদী। ছেরেং গা হলো— সরু নদী। তোমার রোগা পাতলা চেহারা দেখে রসিকতা করছিল।

চিন্তা করো অবস্থা— কাবা ঘরে এসে ঠাট্টা মশকরা শুরু করেছে। কাবা শরীফের কাছে এসে মানুষ আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়— আমি এক মেয়েছেলের ভয়ে ভীত হয়ে গেলাম।

বাবা বললেন, ভীত হওয়ার কী আছে ?

আজহার চাচা বললেন, তুমি কিছু জানো না বলে এমন কথা বলতে পারলে। এই মহিলা যদি একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, তাহলে আর আমাকে উঠতে হতো না। হাজার হাজার হাজি আমার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেত— ইনস্টেন্ট ডেথ। বহু মানুষ এইভাবে মারা গেছে। যাই হোক, এ

মহিলাকে কীভাবে শায়েস্তা করেছি শোনো। ভুল বললাম শায়েস্তা আমি করি নাই। আমাকে কিছু করতে হয় নাই। ব্যবস্থা আল্লাহ্‌পাকই নিয়েছেন। আমি উসিলা মাত্র। সেই ঘটনাও বিস্ময়কর!

আজহার চাচা এই পর্যন্ত বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা, তুই এখন একটু অন্য ঘরে যা। গল্পের এই অংশটা তোর শোনা ঠিক না।

আমি বললাম, অশ্লীল না-কি চাচা?

শ্লীল-অশ্লীল কিছু না। সব গল্প সবার জন্যে না। মা তুই যাতো। আমাকে আদা চা খাওয়াবি বললি— আদা চা কই?

আমি বললাম, স্টোরীর আসল মজার জায়গাটা না শুনে আমি নড়ব না চাচা। আমি একটা আন্দাজ করেছি। দেখি আন্দাজটা মেলে কি-না।

মুন্সায়ী মা, যা রান্নাঘরে যা।

আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। রান্নাঘরে মা নিচু গলায় আমাদের বুয়া তন্তুরী বেগমকে শায়েস্তা করছেন। তন্তুরী কী অপরাধ করেছে বোঝা যাচ্ছে না। মায়ের শাসানি শুনে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু করেছে, যদিও তন্তুরী বেগমের ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ করার ক্ষমতাই নেই। সবচে' বড় অপরাধ যা সে নিয়মিত করে তা হলো তরকারিতে লবণ বেশি দিয়ে দেয়। তারপর সেই লবণ কমানোর জন্যে কাঠকয়লা দেয়। লবণের তাতে কোনো উনিশ বিশ হয় না। খেতে বসে কৈ মাছের সঙ্গে এক টুকরো কয়লা উঠে আসে। মা আমাকে দেখে বিরক্ত মুখে বললেন, মওলানা গিয়েছে?

আমি বললাম, যান নি।

এখনো যায় নি, মানে কী? ছয়টার সময় এসেছে, এখন বাজে আটটা। বাড়িতে গিয়ে এশার নামাজ পড়বে না? মানুষ এমন বেআক্কেল হয় কীভাবে? আর কতক্ষণ থাকবে?

আরো ঘণ্টা দুই থাকবেন। তুমি দেখা করে এসো না।

আমি কেন দেখা করব?

দেখা করলেই উপহার পাবে। উনি সবার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছেন। আমার জন্যে এনেছেন আকিক পাথরের তসবি। আরবের মিষ্টি তেতুল।

তোর বাবার জন্যে কী এনেছে?

বাবার জন্যে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এনেছেন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এমন জিনিস। বাবা যা খুশি হয়েছেন! আনন্দে বলমল করছেন। উপহার কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর দাঁত বের করে হাসছেন।

মা উত্তেজিত গলায় বললেন, কার্পেট না-কি ? ওখানে খুব ভালো পারশিয়ান কার্পেট পাওয়া যায়। আমার বান্ধবী রীতা হজ করতে গিয়ে একটা বেড সাইড কার্পেট এনেছিল। কী যে সুন্দর। (উপহার, গিফট এই জাতীয় শব্দগুলি শুনলেই মা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন।)

আমি বললাম, কার্পেট না। অন্য কিছু।

সেটা কী ?

পাঁচটা প্রশ্ন করে বের করে নাও— হিন্টস দিচ্ছি। এটি একটি পরিধেয় বস্ত্র তবে যে পরিধান করে সে এই বস্ত্র চোখে দেখতে পারে না।

এত কথা পেঁচাচ্ছিস কেন ? জিনিসটা কী বল ?

জিনিসটা দেখে তোমার চোখ যদি কপালে না উঠে যায় তাহলে আমি ফাস্ট ক্লাস মেজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট করিয়ে আমার নাম বদলে ফেলব। মৃন্ময়ীর বদলে নাম হবে ঘৃন্ময়ী। আমার ডাক নাম তখন মৃ থাকবে না, ডাকনাম হবে ঘৃ।

এত কথা বলিস না তো।

মা কৌতূহল সামলাতে পারছেন না— বসার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমি বললাম, সদ্য হজফেরত মানুষের কাছে যাচ্ছ— স্লীভলেস ব্লাউজ পরে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

মা রাগী গলায় বললেন, পাগলের মতো কথা বলছিস কেন ? এটা স্লীভলেস ব্লাউজ ?

হাতা বেশি ছোট তো, এইজন্যেই বললাম—।

তোর বাবার সঙ্গে তো তুই এত ফাজলামি করিস না। আমার সঙ্গে কেন করিস ? আমি তোর বান্ধবীও না, বয়ফ্রেন্ডও না।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। কেউ যখন হাসে সে বুঝতে পারে না তার হাসি কেমন হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি। কারণ আমি আমার সব হাসি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন দেখেছি। এখনো সময় পেলে দেখি। কোন হাসিতে আমাকে কেমন দেখায়, তা আমি জানি। আমি মোটামুটি পাঁচ ক্যাটাগরীর হাসি রপ্ত করেছি।

১. Non commital হাসি। এই হাসিতে কিছুই বোঝা যাবে না।

২. দুঃখময় হাসি। মন কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে হাসি।

৩. বিরক্ত হাসি। অন্যের বোকামি দেখে বিরক্তির হাসি।

৪. আনন্দের হাসি। এই হাসি খুব সাধারণ। কোনো বিশেষত্ব নেই।

৫. মোনালিসা হাসি। বিশেষ কারোর জন্যে।

মা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তন্তুরী বেগম বলল, আফা কতবেলের ভর্তা খাইবেন?

আমি বললাম, না।

দিন দশেক আগে একবার কতবেলের ভর্তা খেয়ে বলেছিলাম, বাহু খেতে চমৎকার তো! এরপর থেকে রোজই সে দু'তিনবার জিজ্ঞেস করে, আফা কতবেলের ভর্তা খাইবেন?

তন্তুরী বেগম আজ রাতের খাবার কী?

ইলিশ মাছের ডিমের ভাজি। ইলিশ মাছ আর পটলের তরকারি। ইলিশ মাছের মাথা আর কাঁটাকুটা দিয়া লাউ।

ইলিশে ইলিশে দেখি ধূল পরিমাণ। ইলিশের একই অঙ্গে এত রূপ? সজনে দিয়ে ছোট মাছের কোনো তরকারি রান্না হয় নি?

জে না।

রান্না করা যাবে না?

ফিরিজে ছোট মাছ আছে, কিন্তুক সেইজনা নাই।

সজনে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি অতি দ্রুত ছোট মাছের তরকারি রান্নার ব্যবস্থা কর।

জে আচ্ছা।

তোমার জন্যে একটা উপহার আছে। আকিক পাথরের তসবি। মক্কা শরীফের জিনিস— এই নাও।

এখন নিতে পারব না আফা, অজু নাই।

টেবিলের ওপর রেখে দিচ্ছি, অজু করে এসে এক সময় নিয়ে যেও।

তন্তুরী বেগম আনন্দিত মুখে ঘাড় কাত করল। আমার পরিচিত খুব কম মানুষকেই আমি পছন্দ করি— তন্তুরী বেগম সেই অতি অল্প সংখ্যক মানুষের একজন। তার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয় মা তার ছোট মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়ের প্রতিটি আঙ্গুর শুনে মজা পাচ্ছে। আবার তন্তুরী বেগম যখন আমার মা'র সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয় সে তার রাগী বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বড় মেয়ে অন্যায়ভাবে কথা বলছে তা সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারলেও কী আর করা— হাজার হলেও মেয়ে।

সজনে ডাঁটার কী ব্যবস্থা করা যায় অতি দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছি। ভাইয়া বাসায় থাকলে কোনো সমস্যা নেই— যেখান থেকে হোক সে সজনে ডাঁটা জোগাড় করবে। কাঁচাবাজার বন্ধ থাকলে কোনো সজনে গাছের খোঁজ বের করে, গাছ থেকে পেড়ে আনবে।

মুশকিল হলো— এই সময়ে ভাইয়ার বাসায় থাকার কোনোই কারণ নেই। রাত বাজে মাত্র আটটা।

ভাইয়া এখন কী একটা কম্পিউটার কোর্স নিচ্ছে। বাংলাদেশ একেক সময় একেক দিকে ঝুঁকে পড়ে। এখন ঝুঁকেছে ইউনিভার্সিটি এবং কম্পিউটারের দিকে। পাড়ায় পাড়ায় ইউনিভার্সিটি। দু'তলা বাড়ি। দু'তলায় ইউনিভার্সিটি ক্লাস, এক তলায় এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং। গ্যারেজে ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবের অফিস। সেই ঘরে রং জ্বলে যাওয়া কার্পেট আছে। ঘড়ঘড় শব্দ হয় এমন এসি আছে। এসিতে গ্যাস নেই। বাতাস ঠাণ্ডা হয় না। একটা এসি চলছে, বিকট শব্দ হচ্ছে— এটাই যথেষ্ট। ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবের ইজ্জত তো রক্ষা হচ্ছে।

একইভাবে শুরু হয়েছে কম্পিউটারের দোকান। যে দোকানের নাম আগে ছিল দিলখোশ চটপটি হাউস, এখন তার নাম DIL Dot.com Computer Heaven.

ভাইয়া যে কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ শিখছে সেই কোম্পানির নাম International Net. কোর্স শেষ হবার পর এই কোম্পানি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব ছাত্রকে বিদেশে চাকরি যোগাড় করে দেবে। এই কোম্পানির ক্লাশ দুই ব্যাচে হয়। সেকেন্ড ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় রাত আটটার পর। ভাইয়ার ফিরতে ফিরতে রাত বারটা একটা বাজে। আগে খাবার টেবিলে তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকত। সে ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত খেয়ে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ত। অন্যদের ডিসটার্ব হবে এইজন্যে খাবার ঘরের বাতি পর্যন্ত জ্বলত না। বারান্দার বাতির আলো তার জন্যে যথেষ্ট। ভাত খেয়ে এঁটো থালাবাসন যে টেবিলে রেখে দিত তা না। সব কিছু ধুয়ে মুছে মিটসেফে তুলে রেখে যেত যাতে বাবা সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে না পারেন রাতে কেউ খেয়েছে। গত বুধবার থেকে বাবার হুকুমে টেবিলে ভাত রাখা বন্ধ হয়েছে। বাবা কঠিন গলায় বলেছেন, ভদ্রলোকের বাড়িতে একটা সিস্টেম থাকবে। রাত দু'টার সময় বাড়ির বড় ছেলে একা একা ভাত খাবে এসব কী? এটা কি পাইস হোটেল? রাত এগারোটায় মধ্যে বাড়ি ফিরলে খাবার আছে। এগারোটায় পরে কেউ যদি আসে তাকে বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হবে। ফ্রীজ খুলে এটা সেটা যে খেয়ে ফেলবে তাও হবে না।

ফ্রীজ খোলা যাবে না। এই হুকুম আমার জন্যেও প্রযোজ্য। আমি রাত এগারোটার মধ্যে না ফিরলে আমার জন্যেও খাবার থাকবে না।

ভাগ্য ভালো ভাইয়া তার ঘরে। দরজা খোলা, বাতি নিভিয়ে সে শুয়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে বলল, বাতি জ্বালাবি না খবরদার।

বাতি নিয়ে ভাইয়ার কিছু সমস্যা আছে। ইলেকট্রিকের আলো তার নাকি চোখে লাগে। চোখ কড়কড় করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। বেশির ভাগ সময়ই ভাইয়া তার ঘরে বাতি নিভিয়ে রাখে। বারান্দার আলোই না-কি তার জন্যে যথেষ্ট।

আমি বাতি জ্বালালাম। ভাইয়া বিরক্ত মুখে উঠে বসতে বসতে বলল, কী চাস ?

আমি সহজ গলায় বললাম, সজনে চাই। ছোট মাছ দিয়ে সজনের তরকারি রান্না হবে। তুমি অতি দ্রুত সজনে কিনে আনবে। এই নাও টাকা। কুড়ি টাকায় হবে না ?

শার্ট গায়ে দিতে দিতে ভাইয়া টাকাটা নিল। অন্য যে-কোনো ছেলের সঙ্গে এইখানেই ভাইয়ার তফাত। অন্য যে-কোনো ছেলে বলত, এত রাতে সজনের তরকারি কেন ? সজনে এমন কোনো তরকারি না যে রাত দুপুরে খুঁজে এনে রাখতে হবে।

ভাইয়াকে কোনো কিছু করতে বললে সে সেই বিষয়ে একটা প্রশ্নও করে না। রাত তিনটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে যদি তাকে বলা হয়, দু'টা দেশী মুরগির ডিম কিনে আনতে, কোনো প্রশ্ন না করেই সে বের হবে। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম হাতে উপস্থিত হবে। একবারও জিজ্ঞেস করবে না, রাত দু'টার সময় ডিমের দরকার কেন ?

তোমার আজ কম্পিউটার ক্লাশ নেই ?

না।

ছুটি না-কি ? কম্পিউটারের ইন্সট্রাক্টরদের কেউ কি মারা গেছে ?

না, আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন ছেড়ে দিয়েছ ?

কম্পিউটার স্ক্রীনের আলো চোখে লাগে। চোখ জ্বালা করে। মাথা দপদপ করে। তা ছাড়া কিছু বুঝিও না। সব কিছু আউলা লাগে।

কম্পিউটারের পড়াশোনা তাহলে বাতিল ?

ইঁ।

ছয় হাজার টাকা ভর্তি ফি জলে গেল ?

ইঁ গেল।

চোখের জন্যে ভালো একজন ডাক্তার দেখাও না কেন ? যত দিন যাচ্ছে তোমার সমস্যাটা মনে হয় বাড়ছে।

ভাইয়া জবাব না দিয়ে বের হয়ে গেল। তার চোখ লাল হয়ে আছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। চোখ উঠলে যেমন হয় ঠিক সে রকম অবস্থা।

ভাইয়া আমার আপন ভাই না, সৎ ভাই। আমার বাবা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তেন তখন যে মেয়েটিকে প্রাইভেট পড়াতেন তাকে বিয়ে করে ফেলেন। তাদের একটা ছেলে হয়— তার নাম রাখা হয় হাসানুল করিম। বাবা পড়াশোনা শেষ করে কী একটা কলারশিপ জোগাড় করে স্ত্রী-পুত্র কেলে ইংল্যান্ড চলে যান।

সেখান থেকেই দু' বছরের মাথায় তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেন। বাবা দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের চাকরি পেয়ে যান। আবার বিয়ে করেন। তাদের একটি মেয়ে হয়। মেয়ের নাম রাখা হয় মুনায়ী। আমি সেই মুনায়ী।

আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন বার তের বছরের একটা ছেলে সুটকেস, ব্যাগ এবং বইপত্র নিয়ে আমাদের বাসায় থাকতে আসে। বাবা গম্বীর মুখে সেই ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন— এর নাম হাসানুল করিম। ক্লাশ ফাইভে পড়ে। এ আমার ছেলে। আমার প্রথম পক্ষের সন্তান। এখন থেকে এই বাড়িতে থাকবে।

আমার মা চোখ কপালে তুলে হেঁচকির মতো শব্দ করে বললেন, এ-কী! প্রথম পক্ষের সন্তান মানে কী ? তুমি কি আরো বিয়ে করেছ না-কি ? আমি দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ ?

বাবা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তুমি দ্বিতীয় পক্ষ।

কী সর্বনাশ! তুমি কি সত্যি আরেকটা বিয়ে করেছিলে ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ করেছিলাম। সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই না। দুর্ঘটনা নিয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলার কিছু নেই। তোমার যদি কিছু বলার থাকে ঠাণ্ডা গলায়, লজিক্যালি বলো। আমার একটাই ভুল হয়েছে, ব্যাপারটা তোমাদের জানানো হয় নি। I am sorry for that. এখন জানলে, ফুরিয়ে গেল।

মা বললেন, ফুরিয়ে গেল ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ ফুরিয়ে গেল। তুমি যদি মনে করো এত বড় অন্যায় যে করেছে তার সঙ্গে বাস করবে না— আমি তাতেও রাজি আছি। My door is open.

মা পুরো ঘটনায় এতই অবাক হলেন যে, চিৎকার চেষ্টামেচি হৈচৈ করতে পারলেন না। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। আসলে তিনি বোকা টাইপ বলে বুঝতেও পারছিলেন না কী করা প্রয়োজন। আমার ধারণা এই ঘটনায় তিনি রাগ বা দুঃখ যতটা পাচ্ছিলেন, মজাও ঠিক ততটাই পাচ্ছিলেন। মা মজা পেতে পছন্দ করেন। বাংলা সিনেমা তিনি খুবই আগ্রহ করে দেখেন। এই প্রথম নিজের জীবনে বাংলা সিনেমা চলে এল। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বড় ধরনের বৈচিত্র্য। খারাপ কী?

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী, একে এক তলার বারান্দাওয়ালা ঘরটায় থাকতে দে। যা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যা। ও সাথে কী কী এনেছে একটু দেখ। টুথপেস্ট, ব্রাশ না থাকলে জামানকে বল কিনে এনে দিতে। টগর এর ডাক নাম। তুই ভাইয়া ডাকবি। তোর চে' বয়সে বড়।

মা'র মতো আমিও খুবই অবাক হয়েছিলাম। তবে অবাক হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার জন্যে মায়া লাগছিল। কারণ ছেলেটা আসার পর থেকে নিঃশব্দে কাঁদছিল। ফুটফুটে একটা ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কারো দিকে তাকাচ্ছে না। তার শরীর সামান্য কাঁপছে। বাবা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? কাঁদবে না। ছেলেটা কান্না বন্ধ করল না। সে এমনভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল যে, চোখের জল নাক বেয়ে শিশিরের ফোটায় মতো টপটপ করে পড়ছিল। তারপর কতদিন কেটে গেছে, ভাইয়া এখন কত বড় হয়েছে, এখনো তার দিকে তাকালে শৈশবের দৃশ্যটা মনে পড়ে। আমি স্পষ্ট দেখি তার নাক বেয়ে টপটপ করে চোখের পানি পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে যায়। চোখের সামনে এই দৃশ্যটা ভাসে বলেই ভাইয়া যে বড় হয়েছে এটা আমার মনে থাকে না। মনে হয় তার বয়স যেন কৈশোরেই থেমে আছে। স্টিল ছবির মতো। ছবির মানুষের বয়স বাড়ে না।

রাত বারোটার মতো বাজে।

আমি আমার ঘরের বারান্দায় বসে আছি। পুরো বাড়িতে শুধু এই জায়গাটা আমার নিজের। এখানে কারোর ঢোকার অনুমতি নেই। আমার শোবার ঘরে যে কেউ আসতে পারে। কিন্তু বারান্দায় না। রেলিং-এর পাশে দু'টা ফুলের টবে অপরাজিতা গাছের চারা লাগিয়েছিলাম। গুরুতে চারা দু'টির অবস্থা জন্মিসের

রোগীর মতো ছিল, এখন অবস্থা ভিন্ন। বারান্দার রেলিং গাছে ছেয়ে গেছে। অপরাজিতা ফুল যে এত সুন্দর তাও আমার জানা ছিল না। বারান্দায় যখন বসি তখন মনে হয় নির্জন কোনো পার্কের অপরাজিতার বনে বসে আছি। আমাকে ঘিরে ফুলের উৎসব হচ্ছে। ঘুমুতে যাবার আগে আমি কিছুক্ষণ এই বারান্দায় বসি।

অপরাজিতা ফুলের কোনো গন্ধ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বারান্দায় যখন বসি তখন অপরাজিতা ফুলের গন্ধ পাই। গন্ধটা অদ্ভুত— বেলী ফুলের সঙ্গে লেবু পাতা কচলালে হয়তো এ রকম গন্ধ হয়। ঘুমুতে যাবার আগে এই বিশেষ গন্ধটা আমার নাকে না এলে ঘুম হয় না।

টানা বারান্দায় কে যেন অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটছে! অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটার মতো মানুষ আমাদের বাড়িতে কেউ নেই। আমরা সবাই খুবই সুস্থির। ভদ্র বিনয়ী এবং নিচু গলায় কথা বলা টাইপ ফ্যামিলি। বাবা যখন মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেন তখনও তাঁর গলা ভদ্রতার সীমা মেনে চলে। পাশের বাড়ির কেউ তাঁর রাগারাগি শুনে ফেলবে কিংবা রান্নাঘরের কাজের বুয়া শুনে ফেলবে এমন কখনো হবে না। বাবা যখন বাড়াবাড়ি ধরনের রাগ করেন তখন নিজে কথা বলা বন্ধ করে দেন। তাঁর রাগের কঠিন কথাগুলো আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হয়। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার দিনে বাবা-মা'র মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই হলো। এক পর্যায়ে বাবা খুবই রেগে গেলেন এবং আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোর মাকে বলতো এ বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন তার মায়ের বা বোনের বাড়িতে যেন থেকে আসে। তাকে অসহ্য লাগছে। মুখের দিকে তাকালেই গায়ে আগুন ধরে যাচ্ছে। প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। ঘাড় ব্যথা করছে। শেষে স্ট্রোক ফোক হয়ে বেকায়দা অবস্থা হবে।

আমি মা'র কাছে গিয়ে বললাম, মা, বাবা বোধহয় তোমার সঙ্গে রাগারাগি করছিল। এখন যে-কোনো কারণেই হোক রাগটা ঝপ করে পড়ে গেছে। বাবা এখন চাচ্ছে পহেলা বৈশাখে তোমাকে যে শাড়িটা কিনে দিয়েছিল তুমি যেন সেই শাড়িটা পরে বাবার সামনে যাও।

মা থমথমে গলায় বললেন, শাড়ি পরে তার সামনে যেতে বলল ? একটু আগে একগাদা কুৎসিত কথা বলেছে, আর এখন বলছে শাড়ি পরে তার সঙ্গে ঢং করতে ? আমি কি কাছুরা না-কি ?

কাছুরা আবার কোন বস্তু ?

কোন বস্তু সেটা তোকে বলতে পারব না। আসল কথা তোর বাপের সঙ্গে অনেক ঢং করেছি। আর ঢং করব না।

ঢং করতে হবে না। তুমি সেজে গুজে সামনে যাও। শুধু একটা রিকোয়েস্ট মা— কালচে টাইপ লিপস্টিক ঠোঁটে দেবে না। তোমাকে মানায় না।

ঐ শাড়ি পরব কী করে? ব্লাউজ বানানো হয় নি।

কাছাকাছি কোনো ব্লাউজ নেই?

খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে।

তুমি খুঁজতে থাক মা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজ প্রথম পরীক্ষা, আধা ঘণ্টা আগে যেতে হবে। সীট কোথায় পড়েছে খুঁজে বের করতে হবে।

ঐ শাড়িটাই বা হঠাৎ করে পরতে বলছে কেন?

ঐ শাড়ি নিয়ে তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই রোমান্টিক কিছু ব্যাপার ট্যাপার আছে। তোমাদের ঝগড়ার ব্যাপারগুলি আমি জানি। রোমান্টিক ব্যাপারগুলিতো জানি না।

আমি মা'র সামনে থেকে চলে গেলাম। মা গেলেন শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ খুঁজতে। তিনি ঠিকই শাড়ি পরে সেজে গুজে বাবার সামনে যাবেন এবং শুকনো গলায় বলবেন, পরলাম তোমার শাড়ি। এখন কী করতে হবে? নাচব?

আমার অতি বুদ্ধিমান বাবা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলবেন ঘটনা কী। তিনি নিজেকে সামলে নেবেন এবং হাসি মুখে বলবেন, বাহ, তোমাকে খুব মানিয়েছে তো। একটু নাচ, খারাপ কী?

আমার মা যে খুবই বোকা টাইপ একজন মহিলা তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। যে-কোনো বিষয় নিয়ে তিনি বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। তাঁর কথা শুনলে মনে হয় ঐ বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান আছে। আসলে তা না, মা জগতের বেশির ভাগ বিষয় সম্পর্কেই কিছু জানেন না। জানার আগ্রহও নেই। তবে এই ঘটনা বাইরের কারোর বোঝার সাধ্যও নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, একবার আমাদের ড্রয়িংরুমে বাবার কিছু বন্ধু (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এদের সঙ্গে বাবার সামান্য যোগাযোগ আছে। দু'তিন মাস পরপর দাওয়াত করে খাওয়ান।) মিলে আড্ডা জমিয়েছে। মা-ও আছেন তাদের সঙ্গে। তুমুল আলোচনা চলছে। আলোচনার বিষয় 'ব্ল্যাক হোল'। মাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছেন। এবং ব্ল্যাকহোলের রহস্যময়তায় তিনি চমৎকৃত। স্টিফান হকিং লোকটির মেধায় অভিভূত।

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি গভীর গলায় বললেন, ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভয়াবহ। সে সবকিছুই টেনে নিজের ভেতর নিয়ে নেয়। আচ্ছা, এখন যদি সমান ক্ষমতার দু'টা ব্ল্যাক হোল সামনাসামনি চলে আসে তখন কী হবে? দু'জনই তো চেষ্টা করবে অন্যজনকে নিজের ভেতর নিয়ে আসতে।

আড্ডা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। তারপর সবাই কথা বলতে শুরু করল— মা'র দেয়া সমস্যা নিয়ে। সবাই মহাউৎসাহী। শুধু বাবা বিরক্ত মুখে মা'র দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ তিনি জানেন— মা ভেবে-চিন্তে কিছু বলেন নি। মনে একটা কথা এসেছে, বলে ফেলেছেন— এখন আবার যাবেন চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতে। দু'টা সমান শক্তির র‍্যাক হোল মুখোমুখি থাকলে মা'র কিছুই যায় আসে না। ওরা ওদের মতো দড়ি টানাটানি করুক। দুইজন একটা সময় দুইজনকে গিলে ফেলুক। চায়ের সঙ্গে নাস্তা ঠিকমতো দিতে পারলেই তিনি খুশি।

অস্থির ভঙ্গিতে টানা বারান্দায় বাবা হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখে এমনভাবে তাকালেন যেন চিনতে পারছেন না। এর একটাই অর্থ— কোনো একটা বিষয় নিয়ে বাবা খুব চিন্তিত। আমি বললাম, বাবা ঘুম আসছে না?

বাবা বললেন, এখনো বিছানায় যাই নি। কাজেই ঘুম আসছে কি আসছে না বুঝতে পারছি না।

এনি প্রবলেম?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, টগরের ঘরে একটা ছেলে এসেছে। ছেলেটাকে আমি চিনি। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেটা মনে হয় রাতে থাকতে এসেছে। আমি নিশ্চিত। আগেও কয়েক রাত এ বাড়িতে কাটিয়েছে।

আমি বললাম, এটা এমন কোনো সমস্যা না। আমি ভাইয়াকে গিয়ে বলছি ছেলেটাকে বিদায় করে দিতে।

ছেলেটির সামনে কিছু বলবি না। এদের ঘাঁটানো ঠিক না। তুই বরং টগরকে ডেকে নিয়ে আয়। যা বলার আমি বলব।

ভাইয়ার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাইয়া চেয়ারে বসে কী যেন লিখছে। এত রাতে আমাকে ঢুকতে দেখে সে কিছু মাত্র অবাক হলো না। যেন সে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। লেখা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, কী ব্যাপার?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল?

ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, না তো!

বাবার ধারণা কেউ তোমার কাছে এসেছিল। বাবা এটা নিয়ে খুব চিন্তিত। ভাইয়া তুমি খুব খেয়াল রাখবে— কেউ যেন তোমার কাছে না আসে। আর যদি এসেও পড়ে, চেষ্টা করবে তৎক্ষণাৎ বিদায় করতে।

তাই তো করি।

বাবার ধারণা— তুমি উল্টোটা করো। মাঝে মাঝে তোমার দু' একজন বন্ধু তোমার ঘরে রাত কাটায়।

আর কিছু বলবি ?

বলব। কথাগুলো শুধু যে বাবার তা না। আমারও কথা। ভাইয়া, সাবধান থাক। সময়টা খুব খারাপ।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তুমি কী লিখছ ?

ভাইয়া চট করে খাতা বন্ধ করে বলল, কিছু লিখছি না। তোর কথা শেষ হয়ে থাকলে চলে যা।

কাউকে চিঠি লিখছ না-কি ?

ভাইয়া মাথা নিচু করে হাসল। তার হাসি মুখ দেখে আমার আবারো মনে হলো— ঢাকা শহরের প্রথম তিনজন রূপবান যুবকের মধ্যে ভাইয়া একজন। শৈশবে যাদের খুব সুন্দর দেখায় যৌবনে তারা কেমন যেন ভোতা টাইপ হয়ে যায়। ভাইয়ার বেলায় ঘটনা অন্যরকম। যত দিন যাচ্ছে, সে ততই সুন্দর হচ্ছে। আমার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। প্রকৃতি রূপবান পুরুষ পছন্দ করে না। তাদের মধ্যে বড় ধরনের কিছু সমস্যা দিয়ে দেয়। ভাইয়ার ভেতর কোনো সমস্যা দিয়ে দেয় নি তো ?

বাবা উদ্ভিগ্ন গলায় বললেন, টগরকে বলেছিস ?

কিছু বলতে হয় নি বাবা। ভাইয়ার ঘর ফাঁকা। মশা-মাছি পর্যন্ত নেই। দেয়ালে একটা কালো রঙের টিকটিকি ছাড়া কিছু নেই।

ভালো করে দেখেছিস ? খাটের নিচে বসে নেই তো ?

খাটের নিচে বসে থাকবে কেন ?

এরা ডেনজারাস ছেলে। খাটের নিচে বসে থাকবে। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। দরজার আড়ালে থাকবে। যা, আবার যা।

কোনো দরকার নেই বাবা।

দরকার আছে কিনা সেটা আমি বুঝব। তোকে দেখতে বলছি তুই দেখ।

আমি আবারো সিঁড়ির দিকে এগুলাম। ভাইয়ার ঘরে দ্বিতীয়বার যাবার কোনো অর্থ হয় না। একতলার বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে চলে আসব। বাবা নিশ্চয়ই দোতলার বারান্দা থেকে টেলিস্কোপ ফিট করে বসে থাকবেন না দেখার জন্যে যে আমি দায়িত্ব পালন করছি কি-না।

ভাইয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাতি নেভানো। আমি নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। কান পাতলাম। ভাইয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। সে যে একা একা কথা বলছে তাও না। যে জবাব দিচ্ছে তার গলার স্বর ভারি। রেডিও-টিভির এ্যানাউন্সারদের মতো গলা। কথাবার্তা হচ্ছে খুবই হাস্যকর বিষয় নিয়ে। মোটা গলার মানুষটা বলছে— শিউলি ফুলের পাতা দিয়ে এক ধরনের ভাজি হয়। টগর তুই খেয়েছিস কখনো ?

ভাইয়া বলল, না।

কচি পাতাগুলি কড়া করে তেলে ভাজা হয়, সঙ্গে থাকে প্রচুর পেয়াজ-রসুন আর শুকনা মরিচ। খেতে অসাধারণ হয়। গ্রামে যখন যাই এটাই হয় আমার প্রধান খাদ্য। দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য কি জানিস ?

না।

দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হলো নাইল্যা পাতা ভাজি।

নাইল্যা পাতাটা কী ?

পাট শাককে বলে নাইল্যা পাতা। পাট শাক রান্নার দুটো পদ্ধতি আছে। একটা ঝোল ঝোল, আরেকটা শুকনা শুকনা। আগুন গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের ওপর শুকনা নাইল্যা পাতা ছড়িয়ে দিয়ে যদি ভাত খাস তাহলে তোর মুখে এই জিনিস ছাড়া কিছুই রুচবে না। দেখি একটা সিগারেট দে।

সিগারেট তো নাই।

সর্বনাশ! সিগারেট ছাড়া এত বড় রাত কাটাবো কী করে ?

দোকান থেকে নিয়ে আসব ?

আরে না। তোর বাসার সামনে পুলিশের দুজন ইনফরমার বসে আছে। তোর বাবা তো সিগারেট খায়— তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ম্যানেজ করতে পারবি না ?

না।

একটা কাগজ দলা পাকিয়ে সিগারেটের মতো বানিয়ে দে। এটাই টানি। কিছু ধোঁয়া যাক। এতে দু'টা কাজ হবে— সিগারেটের তৃষ্ণা মিটবে। ক্ষুধাটা কমবে।

আমি নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। বাবা বেতের চেয়ারে ঝিম ধরে বসে আছেন। তার গা থেকে হালকা গন্ধ আসছে। অর্থাৎ তিনি আড়াই পেগ থেকে তিন পেগ হুইকি খেয়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশে মদ্যপান আইন করে নিষিদ্ধ। তবে বিত্তবানদের জন্যে আইনের ফাঁক আছে। বিত্তবানদের জন্যে বাংলাদেশ

সরকারের আবগারী ডিপার্টমেন্ট মদ খাওয়ার লাইসেন্স ইস্যু করে। সেখানে লেখা থাকে স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে এই পরিমাণ মদ্যপানের অনুমতি দেয়া হলো। বাবার এই লাইসেন্স আছে। বাবা বললেন, কী দেখলি?

দেখলাম কেউ নেই।

খাটের নিচ, বাথরুম সব দেখেছিস?

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখেছি একটা ছেলে বিড়ালের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে বাঁ করে ওর ঘরে ঢুকল। স্ট্রাইপ শার্ট গায়ে।

তুমি তো মানসিকভাবে উত্তেজিত এই জন্যে এসব দেখেছ।

মানসিকভাবে উত্তেজিত হব কী জন্যে?

আজহার চাচা তোমাকে কাফনের কাপড় দিয়েছে এরপর থেকেই তুমি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছ। তোমার চিন্তা কাজ করছে না।

চিন্তা ঠিকই কাজ করছে, আমি শুধু ভাবছি একটা লোক কী করে কাফনের কাপড় উপহার হিসেবে নিয়ে আসে।

উনার কাছে মনে হয়েছে ভালো উপহার। বাবা যাও তুমি শুয়ে পড়। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ করে।

তুই শুবি না?

আমার সামান্য দেরি হবে।

দেরি হবে কেন?

রাতে ভাত খাই নি। এখন দেখি প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। ফ্রীজের ঠাণ্ডা ভাত খাব না। নতুন করে ভাত রাঁধব। তুমি বিড়বিড় করছ কেন?

কাফনের কাপড়টা দিয়ে গাধাটা আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছে। আর তোর মা'র তো বুদ্ধির কোনো সীমা নেই! সে কাপড়টা রেখে দিয়েছে ড্রেসিং টেবিলের উপরে, যেন ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

এক কাজ করো কাপড়টা তুমি আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি ওয়ার্ডডোবে রেখে দেব।

আরে না। তুই বাচ্চা মানুষ। তুই কেন তোর ঘরে কাফনের কাপড় রাখবি!

বাবা তুমি ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করে ঘুমুতে যাও। রাতে না ঘুমালে তোমার খুবই শরীর খারাপ করে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার প্রেসার বেড়েছে। প্রেসার মেপে দেব?

দরকার নেই। গাধাটা কী করেছে শোন, কাফনের কাপড়ে আতর মাখিয়ে রেখেছে। নাক থেকে আতরের গন্ধটা যাচ্ছে না। সাবান পানি দিয়ে নাক ধুয়েছি, তারপরেও যাচ্ছে না। তুই গন্ধ পাচ্ছিস না ?

না, পাচ্ছি না।

মানুষের সামান্য সেন্সও থাকবে না ?

আমার হঠাৎ ইচ্ছা করল বাবাকে একটা বিপদে ফেলতে। কাজটা ঠিক না, অন্যায়। তারপরেও মনে হলো— আচ্ছা দেখি তো কী হয়। আমি বললাম, বাবা সরু নদীর ইন্ডিস ভাষা কী ?

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আজহার চাচাকে তুমি সরু নদীর ইন্ডিস ভাষাটা বলছিলে।

কী বলেছিলাম ?

বলেছিলে ছেরাং গা। ছেরাং হচ্ছে সরু, গা হলো নদী।

ঠাট্টা করছিলাম। ইন্ডিস ভাষা আমি জানি না।

তুমি ঠাট্টা করে বলছিলে না। খুবই সিরিয়াসভাবে বলছিলে। আজহার চাচা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছে।

আমি যে এই ছোট্ট মিথ্যাটা বলেছি তার পেছনে ভালো যুক্তি আছে। যুক্তিটা শুনবি ?

এর পেছনে তোমার কোনো যুক্তি নেই বাবা। যুক্তিটা তুমি এখন ভেবে ভেবে বের করবে। আমি নিশ্চিত তুমি বেশ ভালো যুক্তিই বের করবে। যাই হোক তুমি ভেবে চিন্তে ভালো একটা যুক্তি বের করো। আমি ভোর বেলা শুনব। এখন দয়া করে ঘুমুতে যাও।

বাবা আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন কি-না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি লক্ষ করেছি আজহার এলেই তুই খাতির যত্নের একটু বাড়াবাড়ি করিস। এটা করবি না।

কেন ? আমি বললাম। বাবা, তুমি কি আজহার চাচাকে ভয় পাও ?

বাবা থমথমে গলায় বললেন, ভয় পাবার প্রশ্ন আসছে কেন ?

আমার মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাও। আজহার চাচা না হয়ে যদি অন্য কেউ তোমাকে কাফনের কাপড় দিত তুমি তাকে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দিতে।

আমি ভদ্রতা করেছি। ভদ্রতাটাকে তুই ভেবে বসলি ভয়।

তোমার মধ্যে ভদ্রতার বাইরেও কিছু ছিল।

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, স্মার্ট হওয়া ভালো। কিন্তু নিজেকে অতিরিক্ত স্মার্ট ভাবাটা ভালো না।

আমি স্মার্ট না বাবা। আমি যা করি তা হলো দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করে চার হয়েছে কি-না দেখি। সবার বেলায় তাই হয়। তোমার বেলায় দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করলে চারের কিছু কম হয়। সেই কমটা কোথায় যায় সেটা বুঝতে পারি না।

তুই কী বলতে চাচ্ছিস পরিষ্কার করে বল তো।

আমি শান্ত গলায় বললাম, ভাইয়ার কাছে যে ছেলেটা এসেছে বলে তুমি ভাবছ এই ছেলেটা কে?

আমি কী করে জানব সে কে?

আমার ধারণা তুমি তাকে চেন। তোমার সঙ্গে এই ছেলের কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ হয়েছে। নয়তো তুমি ভয়ে এত অস্থির হতে না।

বাবা কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি রওনা হলাম রান্নাঘরের দিকে। তন্তুরী বেগমকে ডেকে তুলে গরম ভাত রান্না করতে হবে। তন্তুরী বেগমের শাড়ির আঁচলে আলাউদ্দিনের চেরাগের একটা মিনি সাইজ দৈত্য বাস করে বলে আমার ধারণা। এই দৈত্য রান্নাবান্না ছাড়া অন্য কাজ পারে না। যে-কোনো রান্না এই দৈত্য অতি নিমিষে শেষ করে ফেলতে পারে। আমি আমার নিজের জন্যে রান্না করাচ্ছি না। ভাইয়ার ঘরে যে ছেলেটি বসে আছে সে ক্ষিধেয় কাতর আছে। গরম ভাত তার জন্যে। অপ্রত্যাশিতভাবে গরম ভাত পেয়ে সে অভিভূত হবে। এই মজার ঘটনাটা সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে রাখবে এবং অনেক লোকের সঙ্গে গল্প করবে। এই ছেলে যদি বিয়ে করে তাহলে বাসর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে এই গল্পটিও করবে। তার মেয়ে যখন বড় হবে কোনো এক রাতে পিতা-কন্যা ভাত খেতে বসে গল্প করার সময় এই গল্প উঠে আসবে। মেয়ের মা বিরক্ত গলায় বলবে— আচ্ছা এই এক গল্প তুমি ক'বার করবে? বন্ধ করো তো।

মেয়ে বলবে, বন্ধ করতে হবে না, আমার শুনতে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আচ্ছা বাবা যে মেয়ে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিল তার নাম কী?

নাম তো মা জানি না। নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি।

মেয়েটা দেখতে কেমন?

সেটাও বলতে পারছি না। অন্ধকার ছিল তো। ভালোমতো দেখতে পাই নি।

এই পর্যায়ে মেয়ের মা মহা বিরক্ত হয়ে বলবে— ঐ মেয়ে মা রূপবতী ছিল।
রূপবতী না হলে এই এক গল্প তোর বাবা পাঁচ লক্ষবার করে ?

ভাইয়ার ঘরে বসে যে নিচু গলায় গল্প করছিল সে রাতে অবশ্যই ভাইয়ার ঘরে
ঘুমবে না। সে ঘুমবে ছাদে। ছাদে চিলেকোঠার মতো আছে। চিলেকোঠাটা
ষ্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারই এক কোণায় চাদর পেতে শোবার
ব্যবস্থা আছে। বিপদজনক পরিস্থিতিতে এক ছাদ থেকে লাফিয়ে অন্য ছাদে
যাওয়া যায়। এবং অতি দ্রুত পালিয়ে যাওয়া যায়। ভাইয়ার বন্ধুদের অনেকেই
এই কাজটা অতীতে করেছে।

ট্রে হাতে আমি চিলেকোঠার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, খেতে আসুন। ছাদ
এবং চিলেকোঠা অন্ধকার হলেও সিঁড়ি ঘরে বাতি জ্বলছে। তার আলোয় কাজ
চলার মতো দেখা যাচ্ছে। চিলেকোঠায় বাতি আছে। তার সুইচ বাইরে। ইচ্ছা
করলেই আমি বাতি জ্বালাতে পারি। তা না করে আবারো বললাম— ভাত নিয়ে
এসেছি খেতে আসুন। তিন চার সেকেন্ড কোনো রকম শব্দ হলো না— তারপর
হামাগুড়ি দিয়ে ভাইয়ার বয়েসী এক যুবক বের হয়ে এল। তার চোখ ভর্তি
বিশ্ময়। আমি বললাম, আপনি কি অন্ধকারে খেতে পারবেন, না বাতি জ্বালাতে
হবে ?

সে কিছুই বলল না। আমি বললাম, ঘরে খাবার কিছু ছিল না। গরম ভাতের
ওপর ঘি দিয়ে দিয়েছি। শুকনা মরিচ ভেজে দিয়েছি। বেগুন ভাজা আছে। আর
আপনার একটা পছন্দের খাবারও আছে। পাট শাক ভাজি। আমাদের বুয়ার দেশ
ময়মনসিংহের ফুলপুর। সে দেশ থেকে টিন ভর্তি করে পাট শাক শুকিয়ে নিয়ে
আসে।

টগরের সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে
শুনছিলেন ?

জি শুনছিলাম। বাবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে দু'টা সিগারেটও
আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।

থ্যাংক য়ু।

আমি যদি আপনাকে একটা অনুরোধ করি আপনি রাখবেন ?

অবশ্যই রাখব।

ভাইয়ার কাছে কখনো আসবেন না। ভাইয়া বোকা মানুষ। সে কোনো
কিছুতে না থেকেও মহা বিপদে পড়ে যাবে।

তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি আর এ বাড়িতে আসব না।

আপনি খাওয়া শুরু করুন। আপনার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি থাকব। কেউ খুব অগ্রহ করে ভাত খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। হাত ধোয়ার পানি এনেছি। নিন হাত ধোন।

ভাইয়ার এই বন্ধুর নাম আমি জানি না। আগে দেখেছি কি-না মনে করতে পারছি না। সে হাত ধুয়ে খেতে বসেছে। ভাতের দলা মাখিয়ে মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রেখে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, আরাম করে খান তো।

সে খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। ‘একজন ক্ষুধার্ত মানুষ খুব তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে এই দৃশ্য জগতের মধুর দৃশ্যের একটি—’ কার যেন কথা? বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। কথাটা বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম।



প্রথম ক্লাস সকাল সাড়ে নটায়। এই ক্লাসটায় আমি রোজ লেট করি। এবং রোজই ভাবি আজ থেকে ক্লাস শুরু হবার দশ মিনিট আগেই ইউনিভার্সিটিতে চলে যাব। ফজলু মিয়ার ক্যান্টিনে কফি খাব। ফজলু মিয়ার কফি এমন অসাধারণ কিছু না। তবে খুব তাড়াহুড়া করে খেলে অসাধারণ লাগে। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে— এক্ষণি ক্লাসে ঢুকতে হবে, অথচ হাতে মগভর্তি কফি— তখন কফিটা লাগে অসাধারণ।

আমি গাড়িতে উঠতে যাব— দোতলার বারান্দা থেকে মা হাত ইশারায় ডাকলেন। খুবই ব্যস্ত ভঙ্গি। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনো দুর্ঘটনা বাসায় ঘটে গেছে। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, আবার দোতলায় উঠলাম। মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়?

এ ধরনের প্রশ্নের কোনো মানে হয়? মা জানে না আমি কোথায় যাচ্ছি? সকাল নটায় তাড়াহুড়া করে ঘর থেকে বের হবার উদ্দেশ্য তো একটাই।

ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি মা।

আজ না গেলে হয় না?

তেমন ভয়ঙ্কর কোনো কিছু ঘটে গেলে না গেলে হয়। ভয়ঙ্কর কিছু কি ঘটেছে?

আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি?

সেই এক জায়গাটা কোথায়? তাড়াতাড়ি করে বল তো মা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মা ঝলমল করে উঠলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, মৌচাক মার্কেট। সিন্ধু শাড়ির একটা এগজিবিশন হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন।

তুমি দাওয়াতের কার্ড পেয়েছ?

আমি কার্ড পাব কেন? আমি কি মহিলা এমপি? জাস্ট দেখতে যাব। পছন্দের কোনো শাড়ি পেলো কিনব। তুই পছন্দ করে দিবি। অনেক শাড়ি এক সঙ্গে দেখলে আমার মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়! যে রঙটা সেখানে

সবচে' ভালো মনে হয়, বাসায় এনে দেখি সেটাই সবচে' খারাপ।

তুমি শাড়ি কিনবে এইজন্য আমি ক্লাস মিস দেব ?

একদিন দিবি। একদিনে তো তুই এমন কিছু পণ্ডিত হয়ে যাবি না। শাড়ি এগজিবিশনে প্রথম দিনেই যেতে হয়। ভালো ভালো শাড়ি প্রথম দিনেই শেষ হয়ে যায়।

আমি যাব না মা।

এরকম করিস কেন ? তুই তো জানিস আমি একা একা কোথাও যেতে পারি না। আমার একা যাওয়া ঠিকও না।

ভাইয়াকে নিয়ে যাও। ও ঘরে বসে আছে।

ছেলেমানুষ সে, শাড়ির কী বুঝবে ?

না বুঝলে না বুঝবে— মা আমি গেলাম। আজও আমার দেরি হয়ে গেল— ফজলু মিয়ার কফি খাওয়া হলো না।

মা উৎসাহী গলায় বললেন, ফজলু মিয়ার কফি ব্যাপারটা কীরে ? তোর মুখে আগেও কয়েকবার শুনেছি।

আমি জবাব না দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মা-ও নামছেন। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি টেনশনে পড়েছেন। ফজলু মিয়ার কফির রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত টেনশন কমবে না। আমি নিশ্চিত গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মোবাইল বেজে উঠবে। মা জিজ্ঞেস করবেন ফজলু মিয়ার কফি ব্যাপারটা কী-রে ? ফ্লাস্কে করে আমার জন্যে নিয়ে আসিস তো।

মোবাইল টেলিফোনের বামেলা ক্লাসের মধ্যেও চলতে থাকবে। মা যদি শেষ পর্যন্ত শাড়ির এ এগজিবিশনে যান তাহলে সেখান থেকে সাজেশান চেয়ে টেলিফোন আসবে, হালকা গোলাপি রঙটা তোর কাছে ভালো লাগে না হালকা আকাশি ? গাঢ় রঙের কোন শাড়ি কিনব ? মোটা মানুষদের নাকি গাঢ় রঙ মানায়। তাদের চিকন দেখা যায়। সত্যি না-কি ?

যথারীতি আজও ক্লাসে দেরি হলো। নতুন একজন টিচার এসেছেন। রোল কল শুরু হয়েছে। তিনি ডাকলেন, রোল ফিফটিন। আমি ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, ইয়েস স্যার। পুরো ক্লাস এক সঙ্গে হেসে উঠল। আমাদের এই ক্লাসের হাসি রোগ আছে। অতি তুচ্ছ কারণে সবাই আমরা এক সঙ্গে হাসি। নতুন টিচার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— তোমার নাম কী ?

মৃন্ময়ী।

নামটা রেজিস্টার খাতায় আছে, তারপরেও আলাদা করে নাম জিজ্ঞেস করায় আনন্দ আছে। তাই না ?

জি স্যার।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে স্যার ডাকবে না। স্যার ডাক আমার খুবই অপছন্দের। ডিজাইন ক্লাসে আমরা সবাই ছাত্র। ঠিক আছে ?

জি, ঠিক আছে।

যাও বোস। তুমি বসার পর ক্লাশ শুরু হবে।

আমি ফরিদার দিকে এগুচ্ছি। ফরিদার পাশের চেয়ারটা আমার। সব সময় সেখানেই বসি। কিছু একটা সমস্যা মনে হয় হয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একজন ছাত্রী সামান্য দেরি করে ক্লাসে এসেছে। সে তার জন্যে নির্দিষ্ট করা চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছে— এটা এমন কোনো দৃশ্য না যে দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতে হবে। এটা তো আলফ্রেড হিচককের ছবির সেট না। আর্কিটেকচার বিভাগের ফোর্থ সেমিস্টারের ডিজাইন ক্লাস। নতুন টিচারও যে তাকিয়ে আছেন সেটা উনার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি। মেয়েদের মাথার পেছনে ছ'টা অদৃশ্য চোখ থাকে। কোনো পুরুষ যদি পেছন থেকে তার দিকে তাকায় তাহলে সে অদৃশ্য চোখ দিয়ে দেখতে পায়।

মৃন্ময়ী।

জি।

তুমি কি সব সময় এই চেয়ারটায় বস ?

জি।

আজ প্রথমদিন, কাজেই আমি কিছু বলছি না। সবাই আজ তাদের পছন্দের জায়গায় বসবে। কাল থেকে এই নিয়ম থাকবে না। একই চেয়ারে কেউ দ্বিতীয় দিন বসবে না। মানুষ Conditional হতে পছন্দ করে। খাবার টেবিলে দেখবে প্রত্যেকের জন্যে জায়গা ঠিক করা। এই চেয়ারটা মা'র। এই চেয়ারটা বড় মেয়ের। খেতে বসলে ঐ চেয়ার ছাড়া কেউ বসবে না। মানুষ খুবই স্বাধীন প্রাণী কিন্তু অদ্ভুত কারণে সে ভালোবাসে শিকল পরে থাকতে। আমরা যারা ডিজাইন ক্লাসের ছাত্র তাদেরকে শিকল ভাঙতে হবে সবার আগে। মৃন্ময়ী কী বলছি বুঝতে পারছ ?

পারছি স্যার।

আগে একবার বলেছি। আবারো বলি আমাকে স্যার ডাকবে না।

ফরিদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার না ডাকলে আপনাকে কী ডাকব ?

নাম ধরে ডাকবে। আমার নাম কাওসার। বোর্ডে লিখে দিচ্ছি।
ভদ্রলোক বোর্ডের কাছে গিয়ে বড় করে লিখলেন—

COW-SIR

আমি ছোট নিঃশ্বাস ফেললাম। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। নামের বিচিত্র বানান দিয়ে তিনি কি সবাইকে অভিভূত করতে চাইছেন? নাম নিয়ে এই রসিকতা তৈরি করতে তাঁর নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। এই রসিকতায় নিশ্চয়ই অতীতে অনেকে মজা পেয়েছে। আমি পাচ্ছি না। আমার বিরক্তি লাগছে। আচ্ছা আমি কি আমার নাম নিয়ে এমন কিছু করতে পারি? Mrinmoye-কে লেখা যেতে পারে—

MR IN MOYE

তাতে লাভ কি কিছু হয়? নামের আগে MR চলে আসে এইটুকু লাভ। ভদ্রলোকের বয়স কত হবে? পঁয়ত্রিশ কিংবা তারচেয়ে কম। পাঁচমিশালী রঙে ভর্তি শার্ট পরে আছেন। ডান হাতে লাল রঙের ব্যান্ড জাতীয় কিছু। পাংকু বলতে পারলে ভালো হতো। তা বলা যাবে না। ভদ্রলোকের Ph.D ডিগ্রি আছে। আমাদেরকে জানানো হয়েছে— অসম্ভব মেধাবী একজন টিচার জয়েন করছেন। তিনি ডিজাইন ক্লাস নেবেন। ভদ্রলোকের ফেলটুস ছেলে হাতে লাল ব্যান্ড পরলে পাংকু হয়ে যায়, কিন্তু Ph.D ওয়ালা অসম্ভব মেধাবী কেউ কি তা হন? সহজ সাধারণ কিছু পরে থাকলে তাকে অনেক সুন্দর লাগত। আমার ধারণা ভদ্রলোক যদি কালো প্যান্টের ওপর হালকা হলুদ পাঞ্জাবি পরতেন তাঁকে অনেক বেশি মানাত।

ফরিদা ফিসফিস করে বলল, এই লোক না-কি দারুণ ব্রিলিয়ান্ট। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে রেকর্ড নাশ্বার পেয়ে পাস করেছে— কিন্তু নিজের নাম নিয়ে কী ছাগলামি করছে দেখেছিস? আমাদের স্কুলের ছাত্র ভাবছে কি-না কে জানে। যখন ধরা খাবে তখন টের পাবে।

ভদ্রলোক ফরিদার দিকে তাকিয়ে বলবেন— তুমি মনে হয় আমাকে নিয়ে মাছ মাছ করছ।

ফরিদা মুখ শুকনা করে বলল, মাছ মাছ করছি মানে কী স্যার?

মাছ মাছ মানে Fish Fish. তুমি আমাকে নিয়ে ফিসফিস করছ। যাই হোক ভালো করে লক্ষ কর—

আমার নামের মধ্যেই Sir আছে। নামের শুরুতে একটি নিরীহ প্রাণী আছে। আমি নিজেও ঐ প্রাণীটির মতোই নিরীহ। আমি যতদূর জানি আজ

তোমাদের একটা প্রজেক্ট জমা দেবার কথা। টেবিল ল্যাম্প। তোমরা প্রজেক্ট এনেছ ?

ফরিদা বলল, আমি ছাড়া সবাই এনেছে।

তুমি আনো নি কেন ?

আমি কখনোই সময় মতো কোনো প্রজেক্ট জমা দিতে পারি না।

কোনো সমস্যা নেই। তোমার যখন প্রজেক্ট জমা দিতে ইচ্ছা করবে জমা দেবে। এতে নান্নার কাটা যাবে না। আমার ক্লাসে নান্নার কাটা যাবার কোনো সিস্টেম নেই। আর আমার ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দেবার কিছু নেই। প্রজেক্ট জমা নেওয়া শুরু করার আগে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয় ?

ফরিদা বলল, ভালো হয় স্যার।

কাওসার বলল, একটু আগেই বলেছি আমাকে ‘স্যার’ ডাকা যাবে না। আমি প্রশ্নটা আবার করছি— প্রজেক্ট জমা নেওয়া শুরু করার আগে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয় ?

ফরিদা বলল, ভালো হয় ভাইয়া।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক নিজেকে ইন্টারেস্টিং করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এক্ষুণি হয়তো পকেট থেকে কয়েন বের করে কয়েন ভ্যানিসের একটা ম্যাজিক দেখাবেন। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে জোক বলে সবাইকে হাসাবেন। কিছু জোক থাকবে মোটামুটি অশ্লীল। এবং তিনি যে মহাজ্ঞানী এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে কঠিন কঠিন সব তত্ত্ব কথা বলবেন। সদ্য আমেরিকা ফেরত শিক্ষকরা আমেরিকান শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক ফাজলামি শিখে আসে। সেই জিনিস যে বাংলাদেশে চলে না তা বুঝতে পারে না। কিছুদিন আমেরিকান ফাজলামি করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত এই ভদ্রলোক দু’তিন মাসের মধ্যেই বদলাবেন এবং সময়মতো প্রজেক্ট জমা না দেয়ার জন্যে নান্নার কাটা শুরু করবেন।

আচ্ছা বলো, ‘সুন্দর’ ব্যাপারটা কী ? কিছু কিছু বস্তু দেখে আমরা বলি ‘সুন্দর’। কেন বলি ? এই ছেলে নারিকেলের মালা দিয়ে একটা টেবিল ল্যাম্প বানিয়েছে। আমরা বললাম— সুন্দর হয়েছে। কেন বললাম!

কেউ জবাব দিল না। ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর অসুন্দরের প্রভেদটা আমরা কীভাবে করি ?

এবারও সবাই চুপ করে রইল। ভদ্রলোক তিনটা ফুলস্কেপ কাগজ দিয়ে দলা পাকিয়ে তিনটা বলের মতো বানালেন। তিনটা তিন ধরনের বল। তারপর

বললেন, টেবিলের ওপর তিনটা বল দেখতে পাচ্ছ। তিনটা বলের মধ্যে একটা অনেক সুন্দর লাগছে। বলো দেখি কোনটা ?

বেশ কয়েকজন ছাত্র এক সঙ্গে বলল, মাঝেরটা।

ভদ্রলোক বললেন, এখন দেখ কী করি— বলগুলোর ওপর আমি আলো ফেলব। আলো এমনভাবে ফেলা হবে যে মাঝের বলটা আর সুন্দর লাগবে না।

আমি অবাক হয়েই দেখলাম ভদ্রলোকের কথা ভুল না। মাঝখানের বলটা এখন আর সুন্দর লাগছে না, বরং প্রথম বলটা সুন্দর লাগছে।

ভদ্রলোক মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বললেন, এখন বলো দেখি সুন্দর কী ? Define beauty. মৃন্ময়ী তুমি বলো— সুন্দর কী ?

আমি চুপ করে আছি। সুন্দর অসুন্দরের কচকচানিতে যেতে চাচ্ছি না। তাছাড়া আমার মোবাইল বাজতে শুরু করেছে। মা টেলিফোন করেছেন। হয়তো শাড়ি বিষয়ক কিছু বলবেন। সিন্ধু এগজিবিশনে মা যাবেন না তা হবে না। আমি মোবাইল অফ করে দিলাম।

মৃন্ময়ী চুপ করে আছ কেন ? বলো সুন্দর কী ? উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসে বসে বলো। মোবাইলে মনে হয় কেউ একজন তোমাকে ফোন করেছে। নাম্বারটা দেখে রাখ। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে কল ব্যাক করো।

আমি বললাম, যা দেখতে ভালো লাগে তাই সুন্দর।

তুমি বলতে চাচ্ছ যা দেখে চোখ আরাম পায় তাই সুন্দর ?

জি।

তার মানে হলো চোখ সব সময় আরাম পায় না। সব সময় একটা কষ্টের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে সে আরাম পায়। যা দেখে সে আরাম পায় তাকে বলি সুন্দর। এই তো ?

আমি বুঝতে পারছি না— একটু কনফিউজড বোধ করছি।

কনফিউজড বোধ করলে লজ্জা পাবার কিছু নেই। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনেক বিখ্যাত মানুষই কনফিউজড বোধ করেছেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আইনস্টাইন হঠাৎ করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কী ? রবীন্দ্রনাথকে থমকে যেতে হয়েছিল। যাই হোক, মৃন্ময়ী সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে একেকজনের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ থমকে গেল। তিনি বললেন— Young man আসগার না তোমার নাম ?

আসগার খুবই হকচকিয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস স্যার।

তোমার নাম যে আসগার এটা কী করে জানলাম বলো তো?

বলতে পারছি না স্যার।

আমি রোল কল করার সময় সবার নাম দেখে নিয়েছি। সতেরোটা নাম মনে রাখা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না। নাম মনে রাখারও পদ্ধতি আছে। তোমরা চাইলে তোমাদের শিখিয়ে দেব। এখন তুমি বলো— সৌন্দর্য কী?

জানি না স্যার।

মনে করো তুমি গুলশান এলাকায় হেঁটে যাচ্ছ। চারপাশে দালান। তুমি কোনোটাকে বলছ সুন্দর, কোনোটাকে বলছ অসুন্দর। কেন বলছ? বিচার বিবেচনাটা কীভাবে করছ?

আসগার বলল, আমি কোনো বিবেচনা করি না স্যার। আমি হেঁটে চলে যাই। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটি।

ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। সবচে' বেশি হাসলেন কাওসার সাহেব। হাসি থামিয়ে বললেন, ভালো আর্কিটেক্ট হবার সম্ভাবনা তোমার সবচে' বেশি। যারা সারাক্ষণ সুন্দর সুন্দর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা আসল কাজ পারে না। যেমন ধরো আমি। আমি যে ক'টা ডিজাইন করেছি তার সবক'টাই অতি নিম্নমানের। যাই হোক, এসো মূল বক্তব্যে ফিরে যাই— সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার নিজের ব্যাখ্যাটা বলি। খাতা খুলবে না— আমি যা বলব শুধু শুনে যাবে, খাতায় নোট করবে না।

আমার নিজের ধারণা— জীবন্ত কিছু মানেই সুন্দর। জড় বস্তুকে তখনই সুন্দর মনে হবে যখন মনে হবে এর ভেতর প্রাণ আছে। প্রাণটা স্পষ্ট না, অস্পষ্ট। তবে আছে। যখন মনে হবে আছে তখন সেটা আমাদের কাছে সুন্দর লাগে। এক গাদা রট আয়রন তুমি ফেলে রাখলে— এর প্রাণ নেই কাজেই অসুন্দর। ওয়েল্ডিং মেশিন এনে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে তুমি একটা খাট তৈরি করলে। খাটের মধ্যে প্রাণ তৈরি হলো। খাটটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ যখন খাটে ঘুমুতে আসে তখন সে আনন্দিত হয়। কাজেই খাটে সৌন্দর্য তৈরি হলো। এই প্রাণ যে যত বেশি তৈরি করতে পারবে সে তত বড় শিল্পী। আমার বক্তৃতা কি কঠিন মনে হচ্ছে?

না।

এখন একটু কঠিন কথা বলি— সুন্দরের সঙ্গে সব সময় দুঃখবোধ মেশানো থাকে। মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে বেদনাবোধ মেশানো থাকতেই হবে। এডগার

এলেন পোর এই কয়েকটা লাইন ব্যাপারটা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে। খাতা খোল, এই কয়েকটা লাইন খাতায় লিখে নাও। তাঁর মতে সৌন্দর্য হচ্ছে—

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain,
And resembles sorrow only
As the mist resembles the rain.

তোমাদের প্রজেক্টগুলো জমা নিয়ে আমি এখন তোমাদের ছুটি দিয়ে দেব। তোমাদের একটা হোম এসাইনমেন্ট আছে— সৌন্দর্য কী? এই নিয়ে এক পৃষ্ঠার একটা লেখা লিখবে। কোন মনীষী সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলেছেন এইসব কচকচানি না। তুমি কী ভাবছ সেটা লিখবে। ঠিক আছে?

জি ঠিক আছে।

এখন আমি তোমাদের কাছে একটা পরীক্ষা দেব। এক এক করে তোমাদের সতেরো জনের নামই আমি বলব। আমি যখন বলেছিলাম তোমাদের সবার নাম আমি জানি তখন তোমরা সেটা বিশ্বাস করো নি। প্রথমেই যদি আমার কথার ওপর বিশ্বাস না থাকে পরে আরো থাকবে না। টিচার হিসেবে আমি যা বিশ্বাস করাতে চাইব তা বিশ্বাস করাতে পারব না।

ফরিদা বলল, স্যার আপনার পরীক্ষা দিতে হবে না। আপনি ফেল করবেন, তখন আমাদের সবার খারাপ লাগবে।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের নাম্বার বলতে শুরু করলেন। কোনো ভুল হলো না। সবাইকে খানিকটা চমকে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী রোল ফিফটিন— ক্লাসের শেষে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমি হঠাৎ একটা ধাক্কার মতো খেলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করে সম্মতি জানালাম। এই ভদ্রলোকের আলাদা করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কারণটা স্পষ্ট না। তিনি কী বলতে চান সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা থাকলেও নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত রাখা যেত। অ্যাকাশ জোড়া মেঘ থাকলে ছাতা হাতে পথে নামতে হয়। সুন্দরবনে মধুর খোঁজে বাওয়ালীরা যখন ঢোকে তাদের সঙ্গে একজন থাকে গাদা বন্দুক নিয়ে। প্রস্তুতি থাকেই। শুধু আমার কোনো প্রস্তুতি থাকবে না।

আমি লক্ষ করলাম ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা মুখে চাপা হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসগার আমার ডেস্কের কাছে এসে

বলল, আমাদের নতুন স্যারের জন্যে একটা নাম পাওয়া গেছে। তোমার এপ্রোভেল পাওয়া গেলেই নামটা চালু করা যায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার এপ্রোভেলের প্রশ্ন আসছে কেন ?

তোমাকে উনি এপ্রোভ করেছেন বলেই তোমার এপ্রোভেলের প্রশ্ন আসছে। উনি নিজের নাম তো Cow-sir লেখেন, ঐটাই বাংলা করে ‘গরু স্যার’। উনার আপত্তি করার কিছু থাকল না। কি এপ্রোভ করছ তো ?

আমি কিছু বললাম না, তবে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম কাওসার নামের এই ভদ্রলোক অতি দ্রুত ‘গরু স্যার’ হিসেবে পরিচিত হবেন। এমন একটা নামের ভার বহন করার মতো শক্তি ভদ্রলোকের কি আছে ? থাকার কথা না। বেশির ভাগ মানুষের মনের জোর তেমন থাকে না। ভদ্রলোকের অবস্থা ‘ছেড়ে দে ছাত্র সমাজ কেঁদে বাঁচি’ হবার কথা।

স্যার আসব ?

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে কম্পিউটারের কানেকশন জাতীয় কী করছিল। এখন চোখে চশমা। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে ? ভাবটা এ রকম যেন আমাকে চিনতেই পারছেন না। আমি বললাম, স্যার আমি মৃন্ময়ী।

কিছু বলবে ?

আপনি বলেছিলেন ক্লাসের শেষে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমি দেখা করতে এসেছি।

ও আচ্ছা আচ্ছা। সরি ভুলে গিয়েছিলাম। এসো। চেয়ারটায় বোস।

আমি চেয়ারে বসলাম। আমার মেজাজ খারাপ লাগছে। ভদ্রলোক বেশ ভালো করেই জানেন তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। তারপরেও ভান করলেন— তাঁর মনে নেই। এই ভানটা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

মৃন্ময়ী তোমার কি বাড়িতে ফেরার খুব তাড়া আছে ? তাড়া থাকলে আজ চলে যাও। অন্য আরেকদিন কথা বলব— আমি পোর্ট লাইনের কানেকশনটা দিতে পারছি না। কানেকশন না দিতে পারা পর্যন্ত অন্য কোনো দিকে মন দিতে পারছি না।

আপনি কানেকশন দিন আমি অপেক্ষা করছি। কী জন্যে ডেকেছেন এটা না জানা পর্যন্ত আমার নিজের মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করবে।

অস্বস্তি কাজ করবে কেন ?

আজ আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম ক্লাস হলো। ক্লাসের মাঝখানে বেশ

আয়োজন করেই আপনি আমাকে বললেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। অস্বস্তির কারণটা এইখানেই।

তোমাদের এখানে কি এই নিয়ম যে কোনো শিক্ষক তার ছাত্রকে দেখা করতে বলতে পারবে না?

অবশ্যই বলতে পারবে। তবে তার জন্যে কারণ থাকতে হবে।

গল্প করার জন্যে আমি কাউকে ডাকতে পারি না? ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কি একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করা যায় না? সব সময় দূরত্ব থাকতে হবে? আমি নিয়ম ভাঙতে চাই।

নিয়ম ভাঙতে হলে শক্তি লাগে। সেই শক্তি কি আপনার আছে?

আমার ধারণা আছে।

থাকলে তো ভালোই।

ক্লাসে আমার বক্তৃতা তোমার কেমন লাগল?

ভালো। তবে আপনার প্রধান চেষ্টা ছিল আপনি যে অন্যদের চেয়ে আলাদা এটা প্রমাণ করা। কেউ যদি আলাদা হয় এম্মিতেই তা ধরা পড়ে। আয়োজন করে ‘আমি আলাদা’ এটা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আপনার এই জিনিসটা আমার খারাপ লেগেছে।

তোমার নিজের কি মনে হয় না আমি অন্যদের মতো না? আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমাদের ক্লাসে সতেরো জন স্টুডেন্ট। এই সতেরো জনের ভেতর থেকে আপনি আমাকে সিঙ্গেল আউট করে প্রশ্নগুলো করছেন কেন?

কারণ তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। প্রথম দেখাতেই পছন্দের একটা কথা সমাজে প্রচলিত। ঐ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তোমাকে আলাদা একটি মেয়ে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি হয়তো অন্য আর দশজনের মতোই কিন্তু তুমি না। আমার ধারণা হয়েছে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে আমার ভালো লাগবে। এইজন্যেই তোমাকে খবর দিয়েছি। আমি যদি সমাজের আর দশজনের মতো হতাম আমি আমার পছন্দের ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতাম। অল্প অল্প করে তোমার সঙ্গে পরিচয় হতো। একদিন হয়তো ডিজাইনের একটা বই তোমাকে পড়তে দিলাম। বই ফেরত দেবার সময় এক কাপ কফি খাওয়ালাম। টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম যাতে ক্লাসের কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে টেলিফোন করতে পারো। তারপর একদিন তোমার টেলিফোন নাম্বার নিলাম। নানান ধাপ

পার হয়ে আসা। আমি সবগুলি ধাপ এক সঙ্গে পার হতে চাই। তুমি আমার কথায় হার্ট হচ্ছ না তো ?

না হার্ট হচ্ছি না। আমি যখন আপনার ঘরে ঢুকলাম তখন কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি বা না-চেনার ভান করেছেন।

তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ করো নি। আমি শর্ট সাইটেড মানুষ। আমার চোখে চশমা ছিল। কাছের জিনিস দেখার জন্যে আমি যখন চশমা পরি তখন দূরের জিনিস দেখতে পাই না। তোমাকে আমি আসলেই চিনতে পারি নি। তুমি কি কফি খাবে ? আমি খুব ভালো কফি বানাতে পারি।

না, কফি খাব না।

আইসক্রিম খাবে ? আমি শুনেছি ঢাকা শহরে খুব ভালো ভালো আইসক্রিমের দোকান হয়েছে।

না আইসক্রিমও খাব না। আমাকে বাসায় যেতে হবে।

আমি তোমাকে নামিয়ে দেই। বাসাটাও চিনে আসি। কখনো যদি যেতে বলো চট করে চলে যেতে পারব। তোমাকে কষ্ট করে ঠিকানা বলতে হবে না। আমি যদি তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেই তাতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি নেই।

থ্যাংক য়ু।

আমি বিরক্ত বোধ করছি। বিরক্তি চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের একজন শিক্ষক যদি আমাকে বাসায় নামিয়ে দিতে চান তাতে কোনো সমস্যা নেই। মানুষটা নিজেকে আলাদা প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। চেষ্টাটা যে হাস্যকর তাও অদ্রলোক বুঝতে পারছে না। মানুষটা কি বোকা ? যে এক লাফে অনেকগুলি সিঁড়ি পার হতে চায় তার প্রথমেই জানতে চাওয়া উচিত— যাকে নিয়ে সে সিঁড়ি ভাঙতে চাচ্ছে সে কি তা চায় ?

আমি বললাম, স্যার আপনার কি দেরি হবে ?

স্যার হাসিমুখে বললেন, না দেরি হবে না। পোর্ট কানেকশন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক্সপার্ট কাউকে আনতে হবে। ভালো কথা— মোটর সাইকেলে চড়া কি তোমার অভ্যাস আছে ?

মোটর সাইকেল ?

গাড়ি আমার খুবই অপছন্দ। মোটর সাইকেল আমার অতি পছন্দের বাহন। মোটর সাইকেলে You can feel the speed. মোটর সাইকেলে কখনো চড়েছ ?

না।

চড়তে আপত্তি আছে ?

না আপত্তি নেই।

বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে কনসেপ্ট ছিল তার অনেকখানিই তুমি ভেঙে দিয়েছ। মোটর সাইকেলে তুমি আমার পেছনে যাচ্ছ এই দৃশ্য দেখে তোমার বন্ধুরা তোমাকে ক্ষেপাবে না তো ?

না ক্ষ্যাপাবে না।

দ্যাটস ভেরী গুড। যেহেতু এই প্রথমবার তুমি মোটর সাইকেলে চড়বে দেখবে তোমার খুবই ভালো লাগবে। বাতাসে চুল উড়বে, শাড়ির আঁচল উড়বে। তোমার একটা ফিলিং হবে তুমি আকাশে উড়ছ। Flying Dutchman. চিন্তা করতেই ভালো লাগছে না ?

আমি জবাব দিলাম না। ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। নিজের ওপর রাগ লাগছে। আমি তো এরকম ছিলাম না। যা মনে এসেছি বলেছি। আজ কেন এরকম হলো ? মোটর সাইকেলে চড়তে আমার খুবই আপত্তি আছে। অথচ বললাম, আপত্তি নেই। কেন বললাম ? আমিও কি এই ভদ্রলোকের মতোই নিজেকে আলাদা ভাবছি ? না তা ভাবছি না। আমি জানি আমি কী। আমি চাচ্ছি যেন এই ভদ্রলোক মনে করেন আমি আলাদা। আমি বিশেষ কেউ।

স্যার বললেন, মৃন্ময়ী তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে গম্ভীর দৃষ্টিস্বায় পড়ে গেছ। ব্যাপারটা কী বলো তো ?

কোনো ব্যাপার না স্যার।

আমার কী ধারণা জানো ? আমার ধারণা তুমি ঝাঁকুর মাথায় মোটর সাইকেলে চড়তে রাজি হয়েছিলে। এখন ঝাঁক কেটে গেছে। এখন আর রাজি নও। আমার ধারণা কি ঠিক ?

হ্যাঁ ঠিক।

স্যার হাসি মুখে বললেন, আমার আসলে সাইকোলজি পড়া উচিত ছিল। দেখ কত সহজে তোমার মনের অবস্থাটা ধরে ফেললাম। তোমার অস্বস্তি বোধ করার কোনোই কারণ নেই। আমি একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে চা খেয়ে আসব। চা পাওনা রইল। ঠিক আছে ?

জি ঠিক আছে। স্যার আমি যাই ?

আচ্ছা যাও। তোমাকে আলাদা করে ডেকে এনে বিবৃত করেছি— তুমি কিছু মনে করো না।

আমি কিছু মনে করি নি।

আমার ওপর রাগ লাগছে না তো ?

লাগছে না।

একটা ব্যাপার জানতে পারলে তুমি অবশ্যি রাগ করবে। ব্যাপারটা না জানানোই ভালো। কিন্তু আমি লোভ সামলাতে পারছি না। বলেই ফেলি।

স্যার তার সামনের টেবিলে পেপারওয়াইট দিয়ে চাপা দেয়া একটা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি প্রথমে আমার পেছনে মোটর সাইকেলে চড়তে রাজি হবে। তারপর মত বদলাবে। এই ব্যাপারটা আগেই জানতাম। কাগজে লিখে রেখেছি। পড়ে দেখ।

আমি কাগজ হাতে নিলাম। সেখানে পরিষ্কার লেখা— মুনায়ীকে (রোল ফিফটিন) যখন বলা হবে আমার সঙ্গে মোটর সাইকেলে চড়তে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হবে। পরে বলবে— না।

আমি কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে স্যারের ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

আমার প্রচণ্ড রাগ লাগছে। নিজেকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

কেউ যখন নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। চারা গাছ যেমন জল হাওয়ায় বিশাল মহীরুহ হয়। ক্ষুদ্রতার ব্যাপারটাও সে রকম। যত সময় যাচ্ছে নিজেকে ততই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

বাসায় ফিরে মনে হলো আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি খুবই সাধারণ একজন। আলাদা কেউ না। সারাজীবন নিজেকে আলাদা ভেবেছি। এই ভাবার পেছনে কোনো কারণ নেই। নিজেকে অন্যরকম ভাবার একটা খেলা খেলেছি। আমি খুব শক্ত ধরনের মেয়ে। কে কী বলল বা কে আমাকে নিয়ে কী ভাবল তা নিয়ে আমি কখনো ভাবি না— তা ঠিক না। আমি ভাবি। না ভাবলে স্যারের পেছনে মোটর সাইকেলে চড়তে পারতাম। কোনোই সমস্যা হতো না।

তন্তুরী বেগম আমাকে চা দিতে এসে বলল, আফা আপনার কী হইছে ?

আমি বললাম, কিছু হয় নি তো। কেন আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে ?

তন্তুরী বেগম ফিক করে হেসে ফেলে বলল, না গো আফা। আপনারে বড়ই সৌন্দর্য লাগতেছে।

থ্যাংক য়ু।

তন্তুরী মাথা নিচু করে হাসছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, হাসছ কেন ?

তন্তুরী বেগম নরম গলায় বলল, আমরা গেরাম দেশে একটা কথা আছে—
কন্যার যে দিন বিবাহ ঠিক হয় সেই দিন আল্লাহপাক তার রূপ বাড়িয়ে দেন।
তিন দান বাড়ে।

‘বিয়ের কন্যা সুন্দরী
তিন দিয়া গুণন করি।’

তার মানে তোমার ধারণা আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে? রূপ তিন গুণ
বেড়েছে?

হ আফা।

বিয়ে ঠিক হয় নি তন্তুরী, মন খুব খারাপ হয়ে আছে।

আমার অস্থিরতা কমছে না। একটা সময় ছিল— অস্থির লাগলে ছাদে
যেতাম। অস্থিরতা কমতো। এখন তা হয় না। ছাদে গেলে উল্টোটা হয়—
অস্থিরতা বেড়ে যায়। মনে হয় ছাদ থেকে একটা লাফ দিলে কেমন হয়?
নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হাতে-নাতে প্রমাণ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায়।
জীবনের শেষ সময়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। পৃথিবী তার মহা শক্তি দিয়ে
আমাকে আকর্ষণ করবে, আমিও আমার যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে
আকর্ষণ করব।

রাতে খাবার টেবিলে বাবা বললেন, তোর কী হয়েছে রে?

আমি বললাম, কিছু হয় নি তো।

তাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

অন্যরকমটা কী?

দেখে মনে হচ্ছে মুখের শেপে কোনো কিছু হয়েছে। চুল কাটার পর
ছেলেদের চেহারা যেমন হঠাৎ খানিকটা বদলে যায় সেরকম। চুলে কি কিছু
করেছিস?

না, চুলে কিছু করি নি। আমার খুব বেশি মন খারাপ। মন খারাপ হলে
হয়তো মানুষের চেহারা বদলায়।

মন খারাপের কারণ কী?

তেমন কোনো কারণ নেই।

আমাকে বলা যাবে না?

বলার মতো কিছু হয় নি।

আমাকে বলতে না চাইলে তোর মাকে বল। Open up. মন খারাপের
ব্যাপারটা হলো একটা খারাপ গ্যাসের মতো। দরজা জানালা বন্ধ ঘরে এই

গ্যাসটা আটকে থাকে। কাউকে মন খারাপের কথা বললে বন্ধ ঘরের জানালা খুলে যায়। তখন গ্যাসটা বের হতে পারে। জানালা খুলে দে।

বাবাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। জ্ঞানের কথা বলতে পারার আনন্দ। শিক্ষক হবার এই সমস্যা— জ্ঞানের কথা বলতে ইচ্ছা করে। উদাহরণ দিয়ে কোনো জ্ঞানের কথা বলতে পারলে ভালো লাগে। বাবা তার চেহারায় ভালো লাগা ভাব নিয়ে বললেন, মনুয়ী ইদানীং টগর কী করছে না-করছে সে সম্পর্কে কিছু জানিস ?

আমি বললাম, না।

কম্পিউটারের কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, সেটা তো যতদূর জানি সে করছে না।

ভাইয়ার চোখে সমস্যা। সে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না।

চোখে সমস্যা এইসব ভুয়া কথা। কোনো কিছু করার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। সে ধরেই নিয়েছে বাবার মৃত্যুর পর বিরাট বিষয়সম্পত্তির মালিক হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবে। তার চিন্তাটা ঠিক না। যে অপদার্থ তাকে আমি কিছু দিয়ে যাব না। তাকে পথে পথে ঘুরতে হবে। এই কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলিস তো।

তুমি বুঝিয়ে বলো। তুমি শিক্ষক মানুষ। উদাহরণ দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারো। আমি পারি না। এই তো একটু আগে গ্যাস নিয়ে কথা বললে। জানালা খুললে গ্যাস বের হয়ে যাবে— এইসব উদাহরণ তো আমি জানি না।

বাবা আহত চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তিনি মন খারাপ করেছেন। যে মানুষটার মন খারাপ সে তার মন খারাপটা ছড়িয়ে দিতে চায় অন্যদের ভেতর। যার মন উৎফুল্ল সে চায় তার ফুল্ল ভাব ছড়িয়ে দিতে। আমি ঠিক এই কাজটাই করছি। জেনে শুনে করছি— তা না। নিজের অজান্তেই করছি। যে মস্তিষ্ক আমাদের পরিচালনা করছে সে করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। মানুষ স্বাধীন না, সে তার মস্তিষ্কের অধীনে বাস করে।

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ভাইয়ার ঘরে উঁকি দিলাম। জানালা দিয়ে উঁকি। এটা আমার নিয়মিত রুটিনে পড়ে না। কাজটা কেন করলাম ? ঘুমোবার আগে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার জন্যে ? তা তো না। ভাইয়া গল্প করতে পারে না। কিছু বললে ঠোঁট চেপে হাসে। মাঝে মধ্যে মাথা

দোলায়। তা হলে কি আমার অবচেতন মন এই ঘরে কিছু খুঁজছে? ভাইয়ার বন্ধুকে আমি খুঁজছি?

ভাইয়ার ঘরের দরজা ভেজানো। ভেতরটা যথারীতি অন্ধকার। ঘরের ভেতর ভাইয়া ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। ভাইয়া বড় বড় করে শ্বাস ফেলছে এটা শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। ভাইয়া হয়তো ঘুমুচ্ছে।

মৃ! জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিস কেন?

আমি ভাইয়ার কথা শুনে জানালা থেকে সরে এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, তোমার ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে কি-না দেখতে এসেছি।

বাবা পাঠিয়েছেন?

কেউ পাঠায় নি, আমি নিজেই এসেছি।

অন্ধকার ঘরে দেখবি কী? বাতি জ্বালিয়ে দেখ। খাটের নিচে উঁকি দে।

তোমার ঐ বন্ধু আর আসে নি?

কোন বন্ধু?

নাম তো আমি জানি না। মাথায় কোঁকড়া চুল। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ির ছাদে ঘুমায়। যাকে পুলিশ খুঁজছে।

ও আচ্ছা!

তার নাম কী?

ভাইয়া হাসল। নাম বলতে তার বোধহয় কোনো সমস্যা আছে।

আমি তো ভাইয়া পুলিশের কোনো ইনফরমার না। নাম বলতে তোমার সমস্যা কী?

কোনো সমস্যা নেই। বোস, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর ডান দিকেই চেয়ার দেখতে পাচ্ছিস নাকি বাতি জ্বালতে হবে?

দেখতে পাচ্ছি। ভাইয়া, তোমার ঐ কোঁকড়া চুলের বন্ধু— ও কি খুবই ভয়ঙ্কর?

হ্যাঁ ভয়ঙ্কর।

ও করে কী?

এমনিতে কিছু করে না। দিন রাত মন খারাপ করে থাকে। কেউ মজার কোনো কথা বললে খুব মজা পায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ করে ফেলে।

পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। এসএসসি-তে ঢাকা বোর্ডে ফিফথ প্লেস পেয়েছিল। কলেজে ওঠার পর আর পড়াশোনা হয় নি।

এটা তো তার কোনো পরিচয় হলো না ভাইয়া। আমি জানতে চাচ্ছি ও করে কী? কেন ভয়ঙ্কর?

ও ভাড়া খাটে।

ভাড়া খাটে মানে?

যে কেউ তাকে ভাড়া করতে পারে। মনে কর, কেউ খারাপ কিছু কাজ করতে চায়, নিজে করতে পারছে না— ওকে ভাড়া করে নিয়ে গেল।

খারাপ কাজটা কী রকম? মানুষ খুন?

হ্যাঁ।

টাকা দিলেই সে মানুষ খুন করবে?

হ্যাঁ করবে।

মানুষ খুন করতে সে কত টাকা নেয়?

জানি না। আমি জিজ্ঞেস করি নি।

তোমার এত প্রিয় বন্ধু, রাতে তোমার সঙ্গে থাকতে আসে আর তুমি কিছু জিজ্ঞেস করো নি?

ভাইয়া হাসল। মজার কোনো কথা শুনলে মানুষ যেভাবে হাসে ঠিক সেরকম হাসি। আমি বললাম, ভাইয়া আমি যদি তোমার ঐ বন্ধুকে বলি— এই নিন টাকা, আমি অমুক লোকটাকে খুন করতে চাই। সে করবে?

করার তো কথা।

এরকম বন্ধু তোমার ক'জন আছে?

ভাইয়া আবারও হাসল। যেন আবারও আমি মজার কোনো কথা বলেছি।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার ওদের মতো হতে ইচ্ছে করে না?

না। ওরা আমার মতো হয় না। আমিও ওদের মতো হই না। যা, ঘুমুতে যা।

কেউ কি আসবে তোমার কাছে?

ভাইয়া চুপ করে রইল। আমি বললাম, তুমি কিন্তু এখনো ঐ ছেলের নাম বলো নি।

ভাইয়া আবারও বলল, যা ঘুমুতে যা।

আমি ঘুমুতে গেলাম এবং আশ্চর্যের কথা খুবই সুন্দর একটা স্বপ্ন